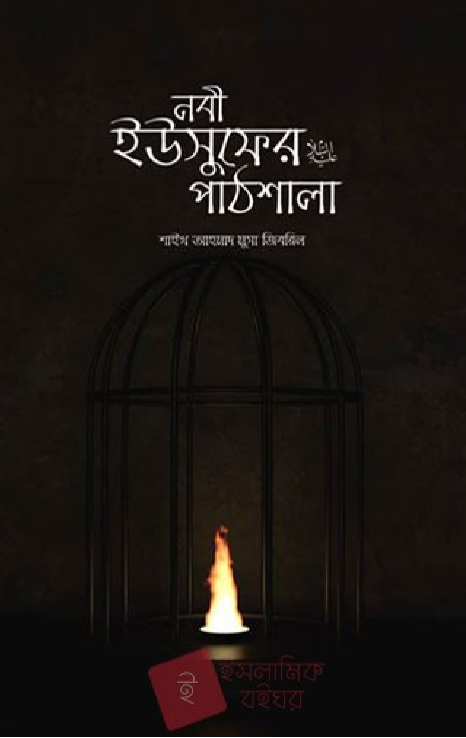
সূচিপত্র



# সূচিপত্র

# নবি ইউসুফের عليه السلام পাঠশালা

প্রথম সংস্করণ
রমাদ্বান ১৪৩৯ হিজরি, মে ২০১৮


ISBN: 978-984-34-4564-7

Ilmhouse

প্রকাশক
ইলমহাউস পাবলিকেশন
ফোন : +৮৮ ০১৮২৮৬১৬০৬৭
www.facebook.com/IlmhouseBD

নির্ধারিত মূল্য: ১০০ টাকা

Nobi Yusufer عليه السلام Pathshala (The University Of Yusuf AS). Translation of several lectures by Shaikh Ahmad Musa Jibril, Published by Ilmhouse Publication. First Edition, May 2018.

# সূচিপত্র

# সূচিপত্র

## সূচীপত্র

# সূচিপত্র

# সূচিপত্র

## ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

**কিছু জিনিস আগুনে পুড়ে যায়, কিছু জিনিস বিশুদ্ধ হয়।**

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলোর দিকে তাকালে একটা প্যাটার্ন দেখা যায়। যারা সত্যের পথে চলেন, যারা হকের সাথে আপস করেন না, যারা আর সবকিছুকে ভুলে, কোনোরকম ছাড় না দিয়ে এক আল্লাহর ﷻ আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরেন—তাঁদের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এটা আল্লাহর ﷻ সুন্নাহ। সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর থাকলে, তাওহিদের প্রশ্নে ছাড় না দিলে, এক সময় না এক সময় আমাদের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবেই। এটাই নিয়ম। আল্লাহ বলেন :

*মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।* [সূরা আনকাবূত, ২৯ : ২-৩]

*আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যাদের ওপর কোনো বিপদ নিপতিত হলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।* [সূরা বাকারা, ০২ : ১৫৫-১৫৭]

সত্যকে স্বীকার করতে গেলে কমফোর্ট যোন থেকে সরতে হয়। নিজের কিছু পছন্দের জিনিস ছাড়তে হয়। ছাড়তে হয় সাজানো-গোছানো, অন্য সবার মতো করে বানানো খেলাঘরের মায়া। কিন্তু বিনিময়ও পাওয়া যায়। এ পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে আর-রাহমান তার বাছাইকৃত বান্দাদের মর্যাদা দান করেন, সম্মানিত করেন। বিশুদ্ধ করেন। এ পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে আর-রাহমান তাঁদের বাছাই করে নেন যারা লাভ করবে তাঁর নৈকট্য। পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ হক ও বাতিলকে আলাদা করেন, মানুষের কাছে তা স্পষ্ট করে তোলেন। পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ বিজয়ের উপলক্ষ প্রস্তুত করেন, আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করেন।

এই দ্বীন মহান, একমাত্র মহানেরাই একে বহনের ক্ষমতা রাখে। আর পরীক্ষার মাধ্যমেই সাধারণ আর অসাধারণের মধ্যেকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারা মহান হয়ে ওঠেন। হক পথের বৈশিষ্ট্যই পরীক্ষা। এই পরীক্ষা বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। বিভিন্নভাবে আসতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা আসবেই। নিশ্চয়ই যে পথে চলতে গেলে বাধা আসে না, যে পথ কণ্টকাকীর্ণ নয়, সে পথ দ্বীন ইসলামের পথ নয়। খুব চমৎকারভাবে এই পথের পরিচয় তুলে ধরেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। কয়েকটি লাইনে ফুটিয়ে তুলেছেন চিন্তার একটি সমুদ্র :

এ পথ তো সেই পথ! যে পথে চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন আদম। ক্রন্দন করেছিলেন নূহ। আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ। যবেহ করার জন্য শোয়ানো হয়েছে ইসমাইলকে। খুব স্বল্প মূল্যে বিক্রি করা হয়েছিল ইউসুফকে, কারাগারে কাটাতে হয়েছিল জীবনের দীর্ঘ কয়েকটি বছর। যবেহ করা হয়েছে নারী-সংস্রব থেকে মুক্ত ইয়াহইয়াকে। রোগে ভুগেছেন আইয়ুব। দাউদের ক্রন্দন, সীমা অতিক্রম করেছে। নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন ঈসা। আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। নানা দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছেন শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ।

আর তুমি এখনো খেল-তামাশায় মত্ত?! [ *আল-ফাওয়াইদ*, ইবনুল কাইয়্যিম]

যুগে যুগে সত্য পথের পথিকেরা সবচেয়ে বেশি যে পরীক্ষাগুলোর মুখোমুখি হয়েছেন তার অন্যতম বন্দীত্ব। কারাগার—জীবিতদের কবর, বিষাদের ঘর, সত্যবাদীদের জন্য অভিজ্ঞতা আর শত্রুদের আনন্দের উৎসস্থল। কারাগার এমন এক পরীক্ষা যা কারও জন্য আনে সোনালি ফসল, আবার কারও জন্য আনে ধ্বংস কিংবা বিচ্যুতি। এ হলো এমন এক পরীক্ষা যা হয় মানুষকে পদাবনত করে, হৃদয়কে সংকুচিত করে অথবা মানুষ এ থেকে লাভবান হয়। বন্দীত্ব তার চিন্তা ও নফসকে পরিশুদ্ধ করে। অনেকের জন্য এ হলো সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, দ্বীনকে তুচ্ছ মূল্যে বিকিয়ে

দেওয়া, বিশ্বাসঘাতকতা, পরাজয় আর ঈমানহারা হবার জায়গা। আবার অনেকের জন্য কারাগার হলো নবি ইউসুফের ﷺ পাঠশালা। এমন এক জায়গা যেখানে বান্দা অনুভব করে যুহদ ও ইবাদতের স্বাদ, ঈমানের মিষ্টতা, সময়ের বারাকাহ আর আখিরাতের তীব্র কামনা। এমন এক পাঠশালা যেখানে স্বীয় প্রতিপালকের স্মরণে পাথরের মতো শক্ত হৃদয়ও কোমল হয়, প্রাণহীন আশাহত কলুষিত অবাধ্য চোখেও নামে অনুতাপ আর তাওবাহর বৃষ্টি। কারাগার এমন এক পাঠশালা যেখানে মস্তিষ্কে মজুদ করা ইলম হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়, ইলম আমলে পরিণত হয়, সত্যের পথে চলার সংকল্প দৃঢ় হয় আর বান্দা অর্জন করে রবের নৈকট্য।

কারাগারে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন নবি ইউসুফ ﷺ। কালক্রমে মহান এ নবির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বন্দীত্বের স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন খুবাইব ইবনু আদি رضي الله عنه, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, আহলুস সুন্নাহর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলসহ সালাফ আস-সালেহিনের অনেকেই। এ পাঠশালার গর্বিত শিক্ষার্থী ছিলেন ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু কাসির, ইবনু হাজর আল-আসকালানী, ইবনু হাযম, ইবনুল আসির, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহসহ উম্মাহর মহিরুহরা, আল্লাহ তাঁদের ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন। বন্দীত্ব আর কারাগার তাঁদের পরাজিত করতে পারেনি, পারেনি সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে। নির্যাতন পারেনি হকের প্রশ্নে আপসে তাঁদের বাধ্য করতে। বরং আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে আপসহীন অবস্থানের কারণে তাঁরা হয়েছিলেন পরিশুদ্ধ, সম্মানিত। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্য স্থাপন করেছেন অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

সাম্প্রতিক যুগেও যখন সোনালি এ পথের উত্তরাধিকারীরা তাওহিদের পতাকা উঁচিয়ে ধরলেন, হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করলেন, মানবরচিত সংঘ, তন্ত্রমন্ত্র ও শরীয়াহর বদলে কিতাবুল্লাহ ও নববী মানহাজের দিকে উম্মাহকে আহ্বান করলেন, পূর্ব ও পশ্চিমের তাওয়াগীত তাদের বন্দী করল, কারাগারে ছুড়ে দিলো। কুরআনে বর্ণিত সেই ফিরআউনের মতোই আধুনিক ফিরাউনরাও বলল :

'যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, তাহলে আমি তোমাকে অবশ্য অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।' [সূরা আশ শুয়ারা, ২৬ : ২৯]

সত্য পথের পথিকদের আবদ্ধ করা হলো। তাঁদের ওপর চালানো হলো অমানুষিক, অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব সব নির্যাতন। পুনরাবৃত্তি হলো সেই একই গল্পের। বদলালো কেবল নামগুলো। পুরোনো কারাগার আর অন্ধকূপগুলো জায়গা দখল করে নিল তোরা, গুয়ান্তানামো, বাগরাম, আবু গ্রাইব, আল হাইর, সাইদনায়া আর নানা ব্ল্যাক সাইট। খুবাইব رضي الله عنه, বিলাল رضي الله عنه আর সুমাইয়্যাদের رضي الله عنها জায়গা নিতে এল সাইদ,

উমার, নাসির আর আফিয়াসহ নাম না জানা আরও অসংখ্য মুওয়াহহিদ। দোররা, চাবুক, মরুভূমির সূর্য, উত্তপ্ত কয়লা, আর বর্শার জায়গা নিল এনহ্যান্সড ইন্টারোগেইশান টেকনিক, ইলেকট্রিকিউশান, সেনসরি ডিপ্রাইভেইশান, ওয়াটার বোর্ডিং আর আবু গ্রাইবের মতো পৈশাচিকতা। কিন্তু বদলালো কেবল খুঁটিনাটিগুলোই। মূল চিত্রনাট্য আজও অপরিবর্তিত। অনেকে হার মানল, আপস কিংবা চুক্তি করল, বিকিয়ে দিলো নিজের বিশ্বাস ও আদর্শকে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর মতোই তাঁদের উত্তরসূরিরা শক্ত হাতে আঁকড়ে রাখলেন তাওহিদের হাতলকে। নিজেদের স্বাধীনতা, সময় ও রক্তের বিনিময়ে, নবি ইউসুফের ﷺ পাঠশালায় নিজেদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আঁধারের এ সুদীর্ঘ মওসুমে পথহারা উম্মাহর সামনে হক ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন।

দুঃখজনকভাবে সোনালি প্রজন্মের উত্তরাধিকারীরা আমাদের মাঝে থাকলেও আজ সার্বিকভাবে আমরা এ পথের মাহাত্ম্য এবং এ পথের পথিকদের ভুলতে বসেছি। বিস্মৃতপ্রায় এ গৌরবের অধ্যায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই আমাদের ক্ষুদ্র এ প্রচেষ্টা। এ পাঠশালার অমূল্য কিছু শিক্ষা আর তিন প্রজন্মের তিন জন রব্বানি আলিমের জীবনী নিয়ে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের লেকচার অবলম্বনে সাজানো হয়েছে "নবি ইউসুফের ﷺ পাঠশালা"। ইমাম আবু হানিফা ﵀ ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর ﵀ অংশ দুটি শাইখের লেকচার সিরিয "Proud Graduates Of The University Of Yusuf AS"-এর বঙ্গানুবাদ। শাইখ আহমাদের নিজের ভাষ্যমতেই, তার ইচ্ছে ছিল এই সিরিযের তৃতীয় পর্ব শাইখ নাসির আল ফাহদকে কেন্দ্র করে সাজানোর। যদিও নানা জটিলতার কারণে পরে তা করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে শাইখ আহমাদের অপর একটি লেকচার থেকে শাইখ নাসির আল ফাহদের অংশটি যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি শাইখের আহমাদের বিখ্যাত "তাওহিদ সিরিয" থেকে তাঁর নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতার কথা উপসংহার হিসেবে যোগ করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ শাইখকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, সত্যের ওপর তাঁকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখুন, তাঁকে দুটি গৌরবময় সমাপ্তির যেকোনো একটি দান করুন।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের অসামান্য এই আলোচনা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমরা গর্বিত। আল্লাহ ﷻ তাঁর দুর্বল বান্দাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নিন, এতে বারাকাহ দান করুন, ভুলত্রুটি, দুর্বলতা ও অক্ষমতা ক্ষমা করে দিন। যদি এর মাঝে কোনো কিছু কল্যাণকর থাকে, তবে সেটা এক আল্লাহরই পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুলত্রুটি আছে, সেটা একান্তই আমাদের। যারা

এ কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন ও আছেন আর-রাহমানুর রাহীম এ কাজকে বিচারের দিনে তাদের আমলের পাল্লায় স্থান দিন। নিশ্চয়ই সাফল্য কেবল আল্লাহর ﷻ পক্ষ থেকে এবং সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই।

সবশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে তাদের দু'আতে মুসলিম বন্দী ও তাঁদের পরিবারদের স্মরণ করার জন্য।

হে আল্লাহ, আপনি তাঁদের হকের ওপর দৃঢ় রাখুন। তাঁদের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করে দিন। হে আল্লাহ, ইয়া আর-রাহমানুর রাহীম, আপনি তাঁদের ওপর আপনার রাহমাহ বর্ষণ করুন, তাঁদের অন্তরে ঈমানকে দৃঢ় করে দিন, তাঁদের সত্যের ওপর অটল রাখুন। তাঁদের বন্দীত্বের অবসান ঘটিয়ে দিন, দুর্বলদের ওপর আপনার রাহমাহ বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো সাহায্যকারী নেই, আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ, পরীক্ষা থেকে আমাদের হেফাযত করুন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর সাহাবিগণ ও তাঁর পরিবারের ওপর।

ইলমহাউস কর্তৃপক্ষ
রমাদ্বান ১৪৩৯, মে ২০১৮

## লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর পিতা শাইখ মুসা জিবরিল ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মুসা জিবরিল তাঁর শৈশবের বেশ কিছু সময় মদিনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি হিফয সম্পন্ন করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার আগেই তিনি *বুখারি* ও *মুসলিম* মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৮৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি *বুখারি* ও *মুসলিমের* সনদসমূহ মুখস্থ করেন, এরপর হাদিসের ছটি কিতাব (কুতুবুস সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। তারপর তিনিও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহর ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াহও লাভ করেন। শাইখ বাকর আবু যাইদের সাথে একান্ত দারসে তিনি আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ শানকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামাহ হামুদ বিন উকলা আশ শুয়াইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তাযকিয়াহ লাভ করেন।

তিনি তাঁর পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ মুসা জিবরিল শাইখ ইহসানকে অ্যামেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান অ্যামেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইন শা আল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল *আর রাহিকুল মাখতুম* বইয়ের লেখক শাইখ সফিয়ুর রাহমান আল মুবারাকপুরির অধীনে দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আব্দুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়্যাহ আস সালিমের অধীনে। শাইখ আতিয়াহ আস সালিম ছিলেন শাইখ আল্লামাহ মুহাম্মাদ আমিন আশ শানকিতির প্রধান ছাত্র এবং তিনি শাইখ আশ শানকিতির ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *আদওয়ায়ুল বায়ান* এর কাজ শেষ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবরাহিম আল হুসাইনেরও ছাত্র ছিলেন। শাইখ ইবরাহিম ছিলেন শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতাহর প্রথম দিকের সদস্য শাইখ আব্দুল্লাহ আল কুদের সাথে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাজ্জ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ আল হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান।

মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল আনসারির অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন তিনি। তিনি শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আল আলবানি ওয়াসিয়াহতে শাইখ আবু মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুসা আল কারনিরও ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাযাহপ্রাপ্ত হন শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে। শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায অ্যামেরিকায় থাকা বিলাদুল হারামাইনের ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাযের কাছ থেকেও তাযকিয়াহ অর্জন করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তিনি (আলিমদের কাছে) পরিচিত এবং উত্তম আকিদাহ পোষণ করেন। শাইখ আহমাদ বর্তমানে অ্যামেরিকায় নিজ পরিবারের সাথে অবস্থান করছেন

বিলাসিতায় পূর্ণ চাকচিক্যময় এ জীবন আসলে একটি কারাগার।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফিরের জন্য জান্নাত।'[১]

কেন দুনিয়াকে কারাগার বলা হলো? এত বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন এই জীবনকে কারাগারের সঙ্গে তুলনা করলেন?

একজন কারাবন্দী দুনিয়ার এমন অনেক ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত হয়, যেগুলো কারাগারের বাইরে স্বাধীন জীবনযাপন করা মানুষ উপভোগ করতে পারে। একইভাবে মুমিন বান্দাদেরও দুনিয়াতে এমন অনেক কিছু থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হয় যেগুলো তারা জান্নাতে উপভোগ করতে পারবে। এ কারণেই মুমিনকে দুনিয়াতে কারাবন্দী বলা হয়। এটি হলো এ হাদিসে মুমিনদের কারাবন্দী বলার একটি কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হলো, একজন কারাবন্দী খুব সীমিত কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়। কারাগারে আপনি হয়তো ফোনে কথা বলতে পারবেন, বিনোদনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় পাবেন[২], খাবার পাবেন। কিন্তু দুনিয়ার স্বাধীন কোনো মানুষের সাথে তুলনা করলে এই সামান্য সুযোগ-সুবিধাগুলোকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হবে। একইভাবে দুনিয়াতে আমরা যেসব বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ উপভোগ করি, পরকালীন জীবনের পুরস্কারের তুলনায় সেগুলো কিছুই না। জান্নাতে এমন পুরস্কার আমাদের

---

[১] *সহিহ মুসলিম, আত-তিরমিযি, আন-নাসায়ি, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান*ও আহমাদ। হাদিসটি আবু হুরাইরা ؓ, সালমান ؓ, ইবনু উমার ؓ, ইবনু আমর ؓ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] এগুলো পশ্চিমা কারাগারগুলোর জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর কারাগারগুলোতে এ সুবিধাগুলোর সবগুলো পাওয়া যায় না।

# সূচিপত্র

সূচিপত্র

জন্য অপেক্ষা করছে, যা কোনো ... দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কোনো হৃদয়ের কল্পনা তা স্পর্শ করতে পারেনি।

এই দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগারস্বরূপ, আবার দুনিয়ারূপী এ কারাগারের ভেতর আছে মানুষের গড়া আরেক কারাগার। আর এই কারাগার নিয়েই আমাদের আলোচনা।

কখনো কখনো বন্দিত্ব মানুষের প্রাপ্য হয়। আবার কখনো কখনো অন্যায় ও যুলুমের শিকার হয়ে মানুষকে বন্দিত্ব বরণ করতে হয়। যুলকারনাইন আমাদের ও ইয়াজুজ-মাজুজের মাঝে যে প্রাচীর তৈরি করেছিলেন, সেটাকে এক ধরনের কারাগারই বলা যায়। ইয়াজুজ-মাজুজ নানা অপরাধে লিপ্ত ছিল, যে কারণে যুলকারনাইন আমাদের ও তাদের মাঝে প্রাচীর তৈরি করে দেন। এ ক্ষেত্রে বন্দিত্ব তাদের প্রাপ্য ছিল। আবার অনেকেই সত্য উচ্চারণের কারণে বন্দী হন। ইউসুফকে (عليه السلام) কারাগারে যেতে হয়েছিল, আর তাই কারাগারকে ইউসুফের (عليه السلام) পাঠশালা বলা হয়।

ইউসুফকে (عليه السلام) যে বিষয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তিনি (عليه السلام) নিজেই তা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। চিন্তা করুন, যে গুনাহ থেকে তিনি (عليه السلام) নিজেই পালাতে চাচ্ছেন সেই অপরাধেই তাঁকে (عليه السلام) অভিযুক্ত করা হলো। দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। তিনি (عليه السلام) একজন সম্মানিত রাসুল, অথচ তাঁর (عليه السلام) সম্মানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হলো। মুসলিম কিংবা কাফির যে-ই হোক না কেন, যুগে যুগে সব অত্যাচারী ও যালিমরা এই একই কৌশল অবলম্বন করে আসছে। যে বিষয়গুলোকে আপনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন এবং এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন, তারা খুঁজে খুঁজে আপনাকে ঠিক সেসব বিষয়েই অভিযুক্ত করবে।

একজন হকপন্থী মুমিনের কাছে বিশ্ব জাহানের রবের সাথে কুফরির চেয়ে হয়রানি, কারাগার, অত্যাচার, নির্যাতন, চাবুক এমনকি মৃত্যুও শ্রেয়। কারাগার ও কুফরি, এ দুয়ের মাঝে বেছে নিতে বলা হলে মুমিন প্রথমটিই বেছে নেবে। এমনকি কোনো পাপ, অন্যায় কিংবা অনৈতিক কাজে বাধ্য হবার বদলেও সে কারাগারকেই বেছে নেবে।

ইউসুফ (عليه السلام) ইচ্ছা করলেই পুরুষত্বের সবচেয়ে তীব্র কামনা মেটাতে পারতেন। বেছে নিতে পারতেন তাঁর (عليه السلام) সময়ের সবচেয়ে সুন্দরী ও উচ্চবংশীয় অভিজাত নারীদের যে কাউকে। পাশাপাশি পেতে পারতেন ভোগবিলাস ও পার্থিব সুখের সব উপকরণ। তিনি (عليه السلام) চাইলেই এই সুযোগ নিতে পারতেন। পারতেন সুবিশাল প্রাসাদের অধিকারী হয়ে সবকিছু নিজ আয়ত্তাধীন করতে। আর সাধারণত সবাই তো এমন

জীবনেরই স্বপ্ন দেখে। তবুও এ সবকিছুর বদলে ইউসুফ ﷺ কারাগারে থাকাকেই পছন্দ করলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

'সে বলল—হে আমার রব, এই নারীরা আমাকে যেদিকে ডাকছে, এরচেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশি প্রিয়।'[৩]

কারাগার নয়তো যিনা—সেই নারী তাঁকে ﷺ এ দুটোর একটি বেছে নিতে বলেছিল। তিনি ﷺ কারাগারকেই বেছে নিয়েছিলেন।

ফিরাউন ও জাদুকরদের ঘটনার দিকে লক্ষ করুন। মুসা ﷺ যখন ফিরাউনের দরবারে গিয়েছিলেন, ফিরাউন তার জাদুকরদের বলেছিল, ইসলাম কিংবা কুফর, যেকোনো একটি বেছে নিতে। একবার পরিস্থিতিটি কল্পনা করুন। ইসলাম ও কুফরের মাঝে একটিকে বেছে নিতে হবে। ইসলামকে বেছে নেওয়ার অর্থ—ফিরাউন তাদের কারাগারে ছুড়ে দেবে, তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, শূলে চড়ানো হবে এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করবে এক ধীরগতির কষ্টকর মৃত্যু। এই হলো মুসা ﷺ ও হারুনের ﷺ রবের প্রতি ঈমান আনার শাস্তি। অন্যদিকে ফিরাউনের প্রতি ঈমান আনলে তাদেরকে তাদের সাধ-স্বপ্ন ও ইচ্ছা অনুযায়ী পার্থিব সুখের যাবতীয় উপকরণ দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ফিরাউনের তাদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—যদি তোমরা বিজয়ী হও, যা চাইবে তা-ই পাবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

'তারা বলল, আমাদের জন্য কি উত্তম পারিশ্রমিক আছে, যদি আমরা বিজয়ী হই? সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৪]

সূরা আল আরাফ ও সূরা আশ-শুয়ারায় আল্লাহ ﷻ আমাদের জানিয়েছেন, ফিরাউন জাদুকরদের বলেছিল, "তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। জাদুকররা

---

[৩] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩

[৪] সূরা আরাফ, ৭ : ১১৩-১১৪

মুসার (عليه السلام) কাছে পরাজিত হবার পরও ফিরাউন তাদের ঘনিষ্ঠ করে নিতে চেয়েছিল। তাদেরকে মুসার (عليه السلام) বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহর ﷻ ওপর ঈমান আনার সাথে সাথে তাদের জীবনের লক্ষ্য বদলে গেল। তাদের জীবন ভিন্ন দিকে মোড় নিল। যে মুহূর্তে তারা আল্লাহর ﷻ প্রতি পরিপূর্ণ দাসত্বের সাথে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ল, সেই মুহূর্ত থেকে কোনো মানুষের সামনে মাথা নত করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে গেল।

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

'এবং জাদুকররা সাজদাহয় পড়ে গেল। তারা বলল, আমরা ঈমান এনেছি বিশ্বজগতের (জিন, ইনসান ও সমস্ত কিছুর) প্রতিপালকের ওপর।'[৫]

এসব ঘটনা এমন সময়ে ঘটছিল যখন তারা সবেমাত্র ঈমান এনেছে। তাদের অন্তরে ঈমান ছিল তাজা, জীবন্ত। ঈমান ছিল বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে। তারা বলেছিল, হে ফিরাউন, আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় আমরা তোমাকে রব বলে স্বীকার করে নেব এবং প্রতিদানে আমরা যা চাইব তা-ই পাব, অথবা আমরা মুসার (عليه السلام) রবের ওপর, বিশ্বজাহানের সত্য প্রতিপালকের ওপর ঈমান আনব। যার পরিণতি হলো কারাবাস, নির্যাতন ও মৃত্যু। আমরা দ্বিতীয় পথকেই বেছে নিলাম।

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

'তারা (জাদুকররা) বলল, আমাদের রব এবং তাঁর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সামনে এসে যাওয়ার পরও আমরা (সত্যের ওপর) তোমাকে প্রাধান্য দেবো, এটা কখনো হতে পারে না। সুতরাং তুমি যা কিছু করতে চাও করো। তুমি তো বড়জোর এ দুনিয়ার জীবনের ফয়সালা করতে পারবে।'[৬]

কখনো বন্দিত্ব কামনা করবেন না, বন্দিত্বের জন্য দু'আ করবেন না।

---

[৫] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২০-১২১

[৬] সূরা ত্বোয়াহা, ২০ : ৭২

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا

শত্রুর সাক্ষাত কামনা কোরো না, তবে সাক্ষাত হয়ে গেলে ধৈর্যসহকারে মোকাবেলা করো।[৭]

কারাগারের ব্যাপারটাও এমন। কখনো বন্দিত্ব কামনা করবেন না, বন্দিত্বের জন্য দু'আ করবেন না; বরং দু'আ করুন আল্লাহ ﷻ যেন কারাগার ও শত্রুর মুখোমুখি হবার কষ্ট থেকে আপনাকে নিরাপদ রাখেন। তবে কখনো যদি কারাগারে ঢুকতেই হয়, ধৈর্য ধরুন। অবিচল থাকুন। একজন পুরুষের মতো এর মোকাবেলা করুন। এখন তরুণদের অনেকের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যায়। তারা কারাগারে যাওয়াকে একটা ক্রেডিটের বিষয় মনে করে। মনে করে এটা কোনো কৃতিত্বের ব্যাপার। এটা যাহির করার মতো কোনো ব্যাপার। মনে করে এটা সেলিব্রিটি বা রকস্টার হবার মতো কোনো বিষয়। আমি বলছি, দিনরাত আল্লাহর ﷻ কাছে দু'আ করুন যেন কখনো, কোনোদিন, এক মিনিটের জন্যেও কারাগারে যেতে না হয়। তবে যদি কারও তাকদিরে বন্দিত্ব থাকে, তাহলে তাকে বন্দী অবস্থায় সত্যের ওপর দৃঢ় ও অবিচল থাকতে হবে।

আল্লাহর শপথ! কারাগারের অন্ধকার দেয়ালের ওপাশে এমনও বন্দী আছেন যারা দিনরাত আল্লাহর ﷻ দরবারে মৃত্যুর জন্য দু'আ করেন। তাদের মাঝে কেউ কেউ এই দু'আতেই সারা রাত কাটিয়ে দেন। এমন অনেকেই আছেন কারাগারের প্রাচীরের আড়ালে যাদের ঈমান নষ্ট হয়েছে, এমনকি কারও কারও মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। তাই সব সময় আল্লাহর ﷻ কাছে নিরাপত্তার জন্য দু'আ করুন।

ইবনু বাত্তাহ ﷺ বলেছেন, শত্রুর এবং কারাগারের পরীক্ষার মুখোমুখি না হওয়ার ইচ্ছা পোষণের কারণ হলো, আমরা এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে জানি না। হতে পারে আপনি পরাজিত হবেন, হতে পারে আপনি ঈমানহারা হবেন। আপনার জন্য কোন ফলাফল অপেক্ষা করছে, আপনি জানেন না। তাই কখনোই এমন কিছু চাইবেন না। অন্যদের মতে, এমন করতে নিষেধ করার কারণ হলো, এমন ইচ্ছা পোষণের ফলে ব্যক্তি নিজের ওপর খুব বেশি ভরসা করতে শুরু করতে পারে। এই অতিরিক্ত আত্মনির্ভরশীলতা তাকে আল্লাহর ﷻ ওপর তাওয়াক্কুল করা থেকে

---

[৭] *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং : ৩০২৪

গাফেল করে দেয়। আল্লাহর ﷻ ওপর ভরসা না করে সে নিজ সামর্থ্যের দিকেই নজর দেয় এবং শত্রুর শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়।

হাসান আল-বাসরি রহ. প্রায়ই বলতেন, প্রতিপক্ষকে কখনো যুদ্ধের আহ্বান কোরো না। সেই সময়ে যুদ্ধ একজনের বিপরীতে এক, দুয়ের বিপরীতে দুই, তিনের বিপরীতে তিন জন, এভাবে শুরু হতো। যেমনটা বদর যুদ্ধের ক্ষেত্রে হয়েছিল। সুতরাং নিজে থেকে কাউকে যুদ্ধের আহ্বান করবেন না। কিন্তু যদি প্রতিপক্ষ আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে, তাহলে সত্যিকারের পুরুষের মতো মোকাবেলা করুন, আল্লাহ ﷻ আপনাকে বিজয়ী করবেন।

অনেকেই কারাগারে যেতে চায়। মনে করে এটা মজার কোনো অভিজ্ঞতা যা নিয়ে মানুষের সামনে ক্রেডিট নেওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে ঢোকার পর কোনো না-কোনো কারণে তারা ভেঙে পড়ে। অনুনয় করে, প্রাণভিক্ষা চায়, অনেকে এ অবস্থায় নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, অনেকে ঈমানহারা হয়। আল্লাহ ﷻ তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আমাদের সব ভাইয়ের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করুন। বন্দী অবস্থায় নিজের মুক্তি ত্বরান্বিত করার জন্য অনেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্যান্য ভাইদের ব্যাপারে মিথ্যাও বলে। খুব অল্প কিছু মানুষই প্রাচীরের ওপাশে অবিচল থাকেন। আমরা আল্লাহর ﷻ কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের সব ভাইয়ের মুক্তি ত্বরান্বিত করেন এবং এর মাধ্যমে তাদের মায়েদের ও পরিবারের হৃদয়গুলোকে প্রশান্ত করেন।

আমাদের আলিমগণ, ইউসুফ ﷺ, এমনকি ফিরাউনের জাদুকরেরাও কখনো বন্দিত্ব কামনা করেননি। কিন্তু যখন তাদের কুফর ও কারাগারের মধ্যে, গুনাহ ও বন্দিত্বের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল, তখন তারা কারাগারকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, আমরা ইসলামকে কুফরের ওপর প্রাধান্য দেবো। গুনাহতে লিপ্ত হবার বদলে বন্দিত্বকে বেছে নেব। এমনই ছিল তাদের পথ।

ইউসুফের ﷺ বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কারণে আল-আযিয তাঁকে ﷺ কারারুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিল। জেলখানায় গিয়ে ইউসুফ ﷺ অনেক মানুষের দেখা পেলেন যারা যুলুমের শিকার। এমন কিছু মানুষের সাথে তাঁর ﷺ পরিচয় হলো, যারা ছিল তাঁর ﷺ কাছে একেবারেই ভিন্নধর্মী ও অপরিচিত। মানুষগুলো ছিল মাযলুম, ক্ষুধার্ত, নির্যাতিত। জীবনের ব্যাপারে নিরাশ। তিনি ﷺ তাদের কাছে গেলেন, তাদের সাথে মিশলেন। তাদের জন্য তিনি ছিলেন রাহমাহ। অনেককেই তিনি ﷺ নতুন করে জীবন নিয়ে আশাবাদী হতে শেখালেন। কখনো বন্দী হলে আপনাকেও ঠিক এই কাজটিই করতে হবে। অন্যান্য বন্দীদের মনোবল বাড়াতে হবে,

হতাশা ঝেড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। ইউসুফ ﵇ কারাগারে অসহায়দের সাহায্য করতেন, তাদের তাওহিদের শিক্ষা দিতেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন।

ইউসুফ ﵇ নিজেও ছিলেন যুলুমের শিকার। অন্যায়ভাবে তাঁকে ﵇ কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ﵇ এ নিয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করে অযথা সময় নষ্ট করেননি। বলেননি যে, "হায়, আমি আজ এখানে কেন! কেন আল্লাহ আমাকে এখানে আনলেন? যদি আল্লাহ আমাকে এখানেই আনেন, তবে আমার আর আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার দরকার কী?"

মূলত একজন সত্যিকারের দা'ঈ কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থের তোয়াক্কা করেন না। তার চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয় আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টি অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে ঘিরে। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাব তিনি করেন না; বরং তাঁর একমাত্র চিন্তা থাকে কীভাবে আল্লাহর দ্বীনের কাজকে আরও সামনে এগিয়ে নেওয়া যায়।

কারাগারের সাথিদের কাছে ইউসুফ ﵇ একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠলেন। সাধারণত কিছুদিন কারও সাথে থাকলে তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কে অন্য সবার চেয়ে একটু আলাদা, বোঝা যায়। বুঝতে পারা যায় কে আমোদপ্রিয়, কে রসিক, কারা হতাশাগ্রস্ত আর কারা ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ। কারাগারে সবাই দাবা খেলছে আর তিনি ﵇ ইবাদতে মগ্ন। অন্যরা মারামারি করছে আর তিনি ﵇ এসে মিটমাট করে দিচ্ছেন। কাজেই সবাই বুঝতে পারছিল এই মানুষটি অন্য সবার চেয়ে আলাদা। এ কারণেই তারা তাঁকে ﵇ বলেছিল,

إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

'নিশ্চয়ই, আমরা তোমাকে মুহসিনুন (সৎকর্মশীল) হিসেবে দেখতে পাচ্ছি।'[৮]

তারা তাঁকে ﵇ প্রশ্ন করেছিল, আপনি কে? কেন আপনি এত আলাদা? আপনি রাত জেগে ইবাদত করেন, রোযা রাখেন... কেন? কার জন্য? আপনার ব্যাপারে আমাদের কিছু বলুন।

[৮] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৬

কারাগারে তাদের সামনে শায়িত এই মানুষটিই عليه السلام ছিলেন সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

তিনি সম্মানিত, তাঁর পিতা সম্মানিত, তাঁর পিতামহ সম্মানিত, তাঁর প্রপিতামহ সম্মানিত, ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইব্রাহিম।[৯]

তারা বলছিল, আপনি অন্য সবার চেয়ে আলাদা। আপনার উদ্দেশ্য কী? কোন বার্তা নিয়ে আপনি এসেছেন? তিনি عليه السلام জবাব দিয়েছিলেন, আমার উদ্দেশ্য তাওহিদ।

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

'হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক বহু রব ভালো, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?'[১০]

কোনটি ভালো? এক ইলাহ্ নাকি বহু? তিনি عليه السلام জেলখানায় দাওয়াহ দিচ্ছিলেন। কারাগারে তিনি عليه السلام কান্নাকাটি করছিলেন না, কাঁদোকাঁদো হয়ে অনুনয় আর অভিযোগ করছিলেন না। তিনি عليه السلام তাওহিদের দাওয়াহ করছিলেন। এমন অবস্থায় আসল বন্দী কে? নবি ইউসুফ عليه السلام, নাকি তাঁকে যে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল সে?

আল-আযিয কারাগারের বাইরে মুক্ত জীবনযাপন করলেও তার জীবনে শান্তি ছিল না। তার দিন কাটছিল নিদারুণ যন্ত্রণায়। অন্যদিকে ইউসুফ عليه السلام ছিলেন কারারুদ্ধ, কিন্তু তাঁর অন্তরে প্রশান্তি ও সুখ ছিল। ইউসুফের عليه السلام চারপাশের লোকেরা দেখতে পাচ্ছিল তিনি عليه السلام কতটা সুখী ও প্রশান্ত। এই আনন্দ তিনি عليه السلام অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবার পরও তাঁর عليه السلام সাথে আরও সময় কাটানোর জন্য তারা বারবার ফিরে আসত। বাইরের মুক্ত পৃথিবীর চেয়েও কারাগারে ইউসুফের عليه السلام সান্নিধ্যকে তারা বেশি পছন্দ করত।

---

[৯] হাদিসটি ইবনু উমারের رضي الله عنه সূত্রে *বুখারিতে* বর্ণিত হয়েছে। হাদিস নং : ৩৩৮২

[১০] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৯

ইউসুফ عليه السلام তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। অনেকেই বন্দীজীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে জানেন না, আল্লাহ ﷻ আপনাদের এ থেকে নিরাপদ রাখুন। আপনি যখন অত্যাচারীর কারাগারে পা রাখবেন, সারা দুনিয়া থেকে সে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আপনার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা কোথায় আছে, কী ঘটছে—কিছুই জানতে পারবেন না। এমন অবস্থায় স্বপ্নগুলোই জাগ্রতদের প্রশান্তির উৎসে পরিণত হয়। ইউসুফ عليه السلام যে দুজন ব্যক্তিকে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়েছিলেন, তাদের একজনকে যাবার আগে বলেছিলেন,

اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ...

'আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে।'[১১]

সাধারণভাবে এ কথায় দূষণীয় কিছু ছিল না। যার অন্তর আল্লাহর ﷻ সাথে শতভাগ জুড়ে আছে এবং যে অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ, এমন ব্যক্তির অন্যান্য বৈধ উপায় খোঁজাতে দোষের কিছু নেই। তবে এ কথা অন্য সবার জন্য প্রযোজ্য হলেও ইউসুফের عليه السلام ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল ভিন্ন। তিনি তো আল্লাহর ﷻ রাসুল, তিনি عليه السلام সম্মানিত, তাঁর عليه السلام পিতা সম্মানিত। তাঁর عليه السلام অবস্থান অনেক উঁচু, তাই তাঁর عليه السلام জন্য মাপকাঠিও আলাদা। ইউসুফ عليه السلام অসংখ্য মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা তাঁর عليه السلام উচ্চ মর্যাদাকে প্রমাণ করে। আল্লাহ তাঁকে عليه السلام শিক্ষা দিতে চাইলেন—আল্লাহওয়ালা অন্যান্য সবাই উপায়ের সন্ধান করতে পারে। কিন্তু তুমি? কে তোমাকে তোমার ভাইদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিল ইউসুফ? কে তোমাকে আযিযের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিল? কে তোমাকে যিনা ও ব্যভিচার থেকে রক্ষা করেছে ইউসুফ? তোমার অন্তর পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সাথে থাকা সত্ত্বেও এখন অন্য উপায়ের খোঁজ করতে শুরু করলে? তুমি উচ্চপদে আসীন, অন্য সবার জন্য দৃষ্টান্ত; কাজেই আস্থা, নির্ভরতা ও উপায়, তুমি এ সবই কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.....

'ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হলো।'[১২]

---

[১১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৪২

[১২] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৪২

এটা ছিল ইউসুফের ﷺ জন্য একটি শিক্ষা এবং আমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। তিনি ﷺ শিখলেন, অন্য কারও কাছে না, বরং সবকিছু একমাত্র আল্লাহর ﷻ কাছেই চাইতে হবে। একমাত্র আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কারও ওপর নির্ভর করা যাবে না। যদিও সেটা অন্য সবার জন্য বৈধ হয়ে থাকে।

যারা আপনাকে ভালোবাসে, যারা আপনার ছাত্র এবং আপনি যাদের সাথে সময় কাটান—তাদের ব্যাপারে, আপনার সব কাজের ব্যাপারে, শুরুতেই নিজের নিয়্যাতকে যাচাই করে নিন। আপনার সব কাজ, সবকিছু যেন শুধু আল্লাহর ﷻ জন্যই হয়। কারণ, বিপদের সময় এরা সবাই আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আগেকার হকপন্থী আলিমদের বেলায় এমনটাই ঘটেছিল আর এভাবেই চলতে থাকবে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টিকেই আপনার লক্ষ্য বানান, সামনের কঠিন দিনগুলোতে কেবল তিনিই আপনার ভরসা। তাঁকে ছাড়া অন্য যার ওপরই আপনি ভরসা করুন না কেন, বিপদের দিন আপনার পাশে তাদের কাউকেই পাবেন না। এমন অনেকে আছে যারা কোনো নেতা, দল কিংবা সংগঠনের মাধ্যমে সম্মানিত হবার, বড় হবার চেষ্টা করে। আসলে সৃষ্টির মাধ্যমে তারা বড় হতে চায়। এ সবকিছু একদিন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নেতা, দল, সংগঠন—একদিন তাদের সবার পতন হবে এবং সেই সাথে আপনারও পতন হবে। কারণ, আপনি তাদের মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর ﷻ ওপরই নির্ভর করুন, তাঁরই মুখাপেক্ষী হোন। আর জেনে রাখুন আল্লাহ ﷻ অক্ষয়, অজেয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোনো কিছুই তাঁর ক্ষতি করতে পারে না। যখন আপনি একমাত্র আল্লাহর ﷻ ওপর ভরসা করবেন, যখন আল্লাহ ﷻ আপনার সাথে থাকবেন, আপনার অবস্থান হবে আকাশের মেঘেরও ওপরে। যখন সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে তখনো আপনি সম্মানিত থাকবেন।

যখন আপনার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হবে, আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, যখন মিডিয়া আপনাকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করবে, আপনার হাজার হাজার শিক্ষার্থী, অনুসারী, বন্ধু, সহকর্মী—সবাই উধাও হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার লক্ষ্য যদি হয় এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা, তবে সেদিন আপনার পাশে আল্লাহ ﷻ এবং এক আল্লাহকেই ﷻ পাবেন। আপনি উপলব্ধি করবেন আপনার জন্য শুধু আল্লাহই ﷻ আছেন। কাজেই, সুখ কিংবা দুঃখ, সব অবস্থায় আল্লাহকেই ﷻ ডাকুন। তাঁকেই খুঁজুন, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কাজ করুন। আপনার প্রতিটি কাজে, আপনার জীবনের প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকেই ﷻ আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন।

যে ফোনটায় অনবরত রিং হতো, সাহায্যের অনুরোধ আর প্রশ্ন আসত, সেই ফোন আজ নিশ্চুপ। প্রতিদিন হাজার হাজার ইমেইলে যে ইনবক্স ভরে যেত, আজ তা শূন্য। অতীতেও আলিমগণ এসবের মুখোমুখি হতেন আর এটা হতেই থাকবে। শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো, উদ্দেশ্য ও নিয়্যাতের ব্যাপারে আল্লাহর ﷻ প্রতি আন্তরিক হওয়া; কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা যার ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন। তিনিই একমাত্র সত্তা যার কাছে কিছু চাইতে পারেন। যখন পরীক্ষা আপনাকে বিহ্বল করে ফেলবে, যখন প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে নিজেকে একা আবিষ্কার করবেন, মনে রাখবেন আল্লাহই ﷻ আপনার জন্য যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা আসলে তাঁরই মুখাপেক্ষী। দাওয়াহর রাস্তায় অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে। একের পর এক পরীক্ষা ও মুসিবত আপনার দিকে ধেয়ে আসবে। এই প্রতিকূলতায় এক আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কাউকেই আপনি পাশে পাবেন না। সুতরাং আপনি যদি বিপদের মুহূর্তে আল্লাহকে ﷻ পাশে চান তবে দুর্যোগের মুখোমুখি হবার আগেই নিশ্চিত করুন, আপনি কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছেন। প্রতি পদক্ষেপের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি কি আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টির জন্য কাজটি করছি? এটা কি ইসলামসম্মত? আল্লাহ ﷻ এতে খুশি হবেন তো? আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টিকেই নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন।

আমাদের সবারই কমবেশি এমন বন্ধুবান্ধব আছে, যারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রায় সবারই এমন অভিজ্ঞতা আছে। এগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে সারাদিন কেটে যাবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমি কোথাও কিছু বলি না, তবে কখনো কখনো এগুলোর মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু বিষয় থাকে যা হয়তো অন্য মুসলিমের জন্য সতর্কতার কারণ হবে। তাই এখানে আমি কিছু কথা বলছি।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, জেলে যাবার পর আমার ক্লাসের একজন ছাত্র কিংবা সমর্থককেও আমি আমার পাশে পাইনি। কেউ ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। একজনকেও পাওয়া যায়নি এ নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য। রমাদানের একেবারে শেষদিকে, ঈদুল ফিতরের দুদিন আগে ওরা আমাকে নিয়ে যায়। প্রথম রাত সেখানে পার করলাম, পরের দিনই ছিল ঈদুল ফিতর। ঈদের দিন সকাল শুরু করলাম বন্দী হিসেবে। সেই কঠিন মুহূর্তগুলোতে আমার মাকে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর দান করুন, আমীন।

জেলে যাবার একরাত আগের কথা। আমি আর বাবা এক ছাত্রের বাড়িতে ইফতারের দাওয়াতে গিয়েছিলাম। আহমাদ জিবরিল আর তার বাবা শাইখ মুসা আসছেন

জানতে পেরে অনেক মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। অনেক লোক হবার কারণে আমরা ইফতারের পর বেশ কিছুক্ষণ সেখানেই কাটিয়ে দিলাম এবং সেখানেই ইশা ও তারাবিহর জামা'আত করলাম। পুরো রমাদ্বান মাসজুড়ে আমি আরেক জায়গায় তারাবিহ পড়িয়েছিলাম। ওইদিন ত্রিশতম পারা শেষ করে কুরআন খতম করার কথা ছিল। সেই ভাইয়ের বাড়িতে বেশ বড়সড় জামাআত হয়েছিল, তাই আমি সেই দিন ওখানেই তারাবিহ পড়ালাম। ত্রিশতম পারা শেষ হলো, আমাদের খতমও হয়ে গেল। সালাত শেষে আমার বাবা বললেন—কাল যদি ঈদ না হয়, তবে আমাদের বাসায় সবার দাওয়াত রইল। পরদিন ঈদ হবার একটা সম্ভাবনা ছিল। আমাদের একদল ঈদের চাঁদ দেখার জন্য বের হয়েছিল, তবে তারা তখনো পর্যন্ত চাঁদ দেখতে পায়নি।

সবাই আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আমার বাবাকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর নেক আমলগুলো কবুল করে নিন। আল্লাহ তাআলা আমার মাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমরা কমপক্ষে দেড় শ থেকে দুই শ লোকের আয়োজন করেছিলাম। আমন্ত্রিত সবাই পরদিন আমাদের বাড়িতে আসলেন। এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদলের খাওয়া শেষ হলে আরেক দল বসতো। আল্লাহ ﷻ আমার মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তাঁকে ফিরদাউস পর্যন্ত পৌঁছে দিন। সেই দিনগুলোতে তারাবিহর পর অনেকেই আমাকে ঘিরে বসতে উন্মুখ হয়ে থাকত। আমার আজও সবকিছু স্পষ্ট মনে আছে, যেন আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দারস দেওয়ার সময় আমার সাথে এত মানুষ হতো যে গাড়িগুলো দেখে মনে হতো কাফেলা যাচ্ছে। আমার পাশে কে বসবে এ নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে যেত। এমনকি এমনও হয়েছে, ভাইয়েরা এসে আমাকে বলছে, আমার গাড়ি কে চালাবে এ নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া হয়েছে। ওয়াল্লাহি এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

আমার শুনানির দিনও কোর্ট প্রাঙ্গণে অনেক মানুষ ছিল। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সবার কাঁধে কাঁধ লেগে যাচ্ছিল। কিন্তু পার্থক্য হলো, আমি আর বাবা ছাড়া সেই দিন ওখানে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"-তে বিশ্বাসী একজন মানুষও ছিল না। এফবিআই প্রসিকিউটর, সরকারি বাহিনীর এজেন্ট, কাউন্টার-টেরোরিযমের অফিসার ও কর্মকর্তাদের সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার উকিল আমাকে বলল, "এই লোকগুলো আপনাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে, এর আগে কোনো শুনানিতে আমি তাদের এমন করতে দেখিনি"। বিচার চলাকালীন আদালতে অনেক মানুষ থাকলে বিচারকের ওপর এক ধরনের চাপ কাজ করে। যেহেতু সরকারপক্ষ জানত

না কী রায় হবে, তাই তারা বিচারকের ওপর চাপ তৈরি করার জন্য অনেক লোক জড়ো করেছিল। যাতে করে বিচারক শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। উকিল আমাকে বলল, "এর আগে অন্য কোনো শুনানিতে এত কর্মকর্তা দেখিনি। এরা আসলেই আপনাদের ঘৃণা করে। কিন্তু তারা আপনার যেসব অনুসারীর কথা বলছে, তারা কোথায়?"

পেছনের দিনগুলোতে ফিরে যাই। শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের বাসার ওপরের তলা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকত। ওয়াল্লাহি আমি এগুলো শুধু এ জন্যই বলছি যেন সবাই এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এর পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কয়েকদিন আগে আমি আমাদের পুরোনো কফি মেশিনটা দেখছিলাম। আমাদের মেশিনটা ছিল দোকানের বড় মেশিনগুলোর মতো। ছোটগুলো দিয়ে আমাদের কাজ চলত না, কারণ বাসায় সব সময়ই কোনো না-কোনো অতিথি থাকত। কয়েকদিন আগে মেশিনটা চোখে পড়লো। মেশিনটার ওপর এখনো লেখা আছে—এজে'র ইলম ক্যাফে। ছাত্ররা আমাদের বাড়ির নাম দিয়েছিল আহমাদ জিবরিলের ইলম ক্যাফে।

বাসায় সব সময় মানুষের আসা-যাওয়া করত—শেখা, শেখানো, দাওয়াহ চলতেই থাকত। আল্লাহ ﷻ আমার মাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। প্রয়োজনীয় সবকিছুর জোগান দেওয়া, দেখাশোনা করা, রান্নাবান্না, খাবার পরিবেশন, কফি—এ সবকিছুই তিনি একা সামলেছেন। এখনো আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে আছে। বয়ান কিংবা হালাকাহ শেষে ভাইয়েরা আমার পেছনে পেছনে আমাদের বাসার বাথরুমের দরজা পর্যন্ত চলে আসত। বাসায় এত মানুষ আসত যে অনেককে আমাদের বাসার বাথরুমের দরজায় বসতে হতো। আমার এখনো সব স্পষ্ট মনে আছে।

আমার মামলার বিচারক ছিল বেশ খাটো। লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট। কিন্তু সেই দিন এই পাঁচ ফুট লম্বা বিচারকের সামনে দাঁড়ানোর জন্য একজন লোকও ছিল না। তাহলে আপনারা কি মনে করেন সব আদালতের আদালতে গিয়ে দাঁড়াবার দিন আপনার পাশে কাউকে পাবেন? পাঁচ ফুট লম্বা এক মানুষের সামনে যদি তারা দাঁড়াতে না পারে, তবে আলিমুল খাবির—যার কুরসি সমস্ত আসমান ও জমিনের চেয়েও বিশাল—তাঁর সামনে তারা কীভাবে দাঁড়াবে? তাই প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার উদ্দেশ্য যাচাই করুন। এতকিছু বলার কারণ এটাই। প্রতিটি কাজের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি এটা আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টির জন্য করছেন? কখনো নিজের পাশে অনেক মানুষ দেখতে পেলেও শুধু আল্লাহর ﷻ কথাই ভাবুন। সবকিছু আপনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করছেন তো? কারণ, যখন বিপদ আসবে সবাই আপনার পাশ থেকে উধাও হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে আপনি একমাত্র আল্লাহকেই ﷻ পাশে পাবেন।

আপনি আল্লাহর ﷻ হকের হেফাযত করুন, তিনিই আপনাকে হেফাযত করবেন। বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণের এটিই সর্বোত্তম পদ্ধতি। ইয়া আল্লাহ, আমি শুধু আপনার জন্যই এটা করছি—সর্বদা সব সময়।

হাতিম আল-আসাম ্রঃ নামের একজন ব্যক্তি বাগদাদে ইমাম আহমাদের ্রঃ সাথে দেখা করতে গেলেন। হাতিম ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান। ইমাম আহমাদ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "কীভাবে আমি মানুষের কাছ থেকে শান্তিতে থাকতে পারি?" হাতিম বললেন, "তাদের দেবেন কিন্তু তাদের কাছে থেকে কিছু গ্রহণ করবেন না। তাদের সম্পদ দেবেন কিন্তু কিছু গ্রহণ করবেন না। তারা আপনাকে আঘাত করবে, আপনি পাল্টা আঘাত করবেন না। আপনার যা আছে তা-ই দিয়ে সাধ্যমতো তাদের খিদমাত করবেন এবং কখনো তাদের কাছে কিছু চাইবেন না।" ইমাম আহমাদ বললেন, "এটা মেনে চলা তো খুব কঠিন হাতিম। এ তো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।" হাতিম বললেন, "খুব সম্ভবত তারপরও আপনি তাদের কাছ থেকে শান্তি পাবেন না।"

মানুষের সাথে চলার ব্যাপারটা এমনই। তাই এক আল্লাহর ﷻ ওপরই নির্ভর করুন এবং আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কারও মুখাপেক্ষী হবেন না, আর কারও কাছে সাহায্য চাইবেন না। আল্লাহ ﷻ ইউসুফকে ﷺ এই বিষয়টিই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়টি শেখার জন্য ইউসুফ ﷺ কারাগারে আরও সাত বছর থাকলেন। এই শিক্ষাগ্রহণের পর, কারাগার থেকে মুক্ত হবার পর তিনি কী বলেছিলেন দেখুন। মুক্ত হবার পর তার প্রথম কথা ছিল :

وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ

'তিনি আমাকে জেল থেকে বের করেছেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'[১০]

কে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন? কার অনুগ্রহে আমি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছি? আমার রব, আমার রব, আমার রব! আমাদের রব!

মুক্তির কারণ হিসেবে তিনি কোনো মানবীয় কিংবা পার্থিব উপায় বা উপকরণের কথা বলেননি। হতে পারে এর পেছনে হাজারটা পার্থিব কারণ ছিল, কিন্তু তিনি শুধু এক আল্লাহর ﷻ কথাই বলেছেন। কারণ, আসলে আল্লাহই ﷻ তো তাকে মুক্তি দিলেন। কোনো উকিল তাঁকে মুক্ত করেনি, আইনের ফাঁকফোকর তাঁকে মুক্ত করেনি,

[১০] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০০

মামলায় জিতেও তিনি মুক্ত হননি। তাঁকে কারাগার থেকে বের করে এনেছেন আল্লাহ ﷻ।

কারাগার কখনো কখনো আত্মশুদ্ধির কাজ করে। এটা এমন চমৎকার এক পাঠশালা, যা মানুষকে আরও বেশি ভালো হতে শেখায়। এমন কত লোক আছে যারা কারাগারে সালাত শুরু করেছে, অথচ আগে তারা কখনোই সালাত আদায় করেনি। কত লোক আছে যারা আল্লাহর ﷻ দিকে ফিরে এসেছে অথচ এর আগে তারা ছিল আল্লাহবিমুখ। কত লোক আছে যারা কুরআন হিফয করেছে অথচ কারাগারের বাইরে তারা কিছুতেই কুরআন আত্মস্থ করতে পারেনি কিংবা করেনি। কত লোক আছে যারা কারাগারে ইলম অর্জন করেছে অথচ বাইরের মুক্তজীবনে তা পারেনি। এমন আরও কত লোক আছে যারা কারাগারে আকিদাহর জ্ঞান লাভ করেছে এবং সুন্নাহর অনুসরণ করতে শিখেছে?

একজন প্রকৃত মুমিনের সাথে ভালো কিংবা মন্দ যা-ই ঘটুক না কেন, তিনি একে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ

মুমিনের ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যজনক! তার প্রত্যেকটা কাজই কল্যাণকর।[১৪]

সে হয়তো জানে না ঘটনার পেছনের হিকমাহ কী, কিংবা সে হয়তো তা অনুধাবন করতে পারছে না। কিন্তু তবুও সে বিশ্বাস করে এটা তার জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ ﷻ কখনো কখনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের কারাগারে পাঠান। এই পরীক্ষা এবং এর পেছনের হিকমাহ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই ﷻ জানেন। আবারও বলছি, কখনোই বন্দিত্ব কামনা করবেন না। তবে যদি কখনো বন্দী হতেই হয়, তাহলে মনে রাখবেন মুমিন কেবল এক আল্লাহর ﷻ ওপরই ভরসা করে। যা কিছু আল্লাহর ﷻ পক্ষ থেকে নির্ধারিত তা সে মেনে নেয়, এ ব্যাপারে সে কোনোরকম অভিযোগ, অনুযোগ কিংবা দোষারোপ করে না। আর এটা কাদা ও কাদরে বিশ্বাসের মৌলিক ও প্রাথমিক দিক।

কারাগারে যাবার আগে আমি একটি কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে যেতাম। সেখানকার কিশোরদের দাওয়াহ দিতাম। তাদের মাঝে বেশ কিছু মুসলিম তরুণ ছিল, তাই প্রতি দু-সপ্তাহে কিংবা মাঝে মাঝে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার করে সেখানে যাওয়া

[১৪] *সহিহ মুসলিম*: ৭৬৯২

হতো। আমার সাথে তাদের কোনো ঝামেলা ছিল না, না বলার মতো কোনো কিছু ঘটেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তারা আমাকে বলল, আপনার আর এখানে আসার অনুমতি নেই। এটা ছিল ২০০১-এর দিকের ঘটনা। এ ধরনের কারাগারে ইমাম হতে গেলে খুব সামান্য তদন্ত আর ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, প্রায় সবাই এসব জায়গায় ঢোকার ছাড়পত্র পায়। কিন্তু তারা আমাকে বলেছিল, আমার সেখানে ঢোকার অনুমোদন নেই।

এ ঘটনার প্রায় এক বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে আমি একটি ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) জেলের বাসিন্দায় পরিণত হই। ফেডারেল জেলের ইমাম হবার জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। নানা ধাপ অতিক্রম করে কাফিরদের অত্যন্ত আস্থাভাজন হতে হয়। ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) জেল কিংবা স্টেইট (রাজ্য) কারাগারের ইমাম হতে হলে কাফিরদের যতটা আস্থাভাজন হতে হয়, সেটা অর্জন করতে হলে আসলে আগে নিজের ঈমান পুরোপুরি ত্যাগ করতে হয়। আমি স্পষ্টভাবে খোলাখুলি কথাগুলো আপনাদের বলছি, কারণ এ ব্যাপারটি নিয়ে স্পষ্ট আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আল্লাহর শপথ! বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় মুসলিম বন্দীদের প্রতি মুসলিম ইমামদের চাইতে ইহুদি র‍্যাবাই ও খ্রিষ্টান পাদরিরা বেশি দয়ালু হয়। সুতরাং কারাগারে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া ওইসব ইমাম ও তথাকথিত মুসলিমরা আসলে কাফিরদের চেয়েও বেশি মুসলিমবিদ্বেষী। তাদের কারণে মুসলিম বন্দীদের যে কী পরিমাণ ভোগান্তি পোহাতে হয়, সেটা চিন্তাও করা যায় না। ফেডারেল জেলগুলোতে কাফিররাও যেসব অত্যাচার করা থেকে পিছিয়ে যায়, এই মুসলিমরা আগ বাড়িয়ে ওইসব নির্যাতনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়।

আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল কিশোর সংশোধনাগার, স্টেইট এবং ফেডারেল জেলগুলোতে তালিম দেওয়ার। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট কিশোর সংশোধনাগারে ঢোকার ছাড়পত্রই তারা আমাকে দিচ্ছিল না। কিন্তু আল্লাহর ﷻ পরিকল্পনা দেখুন! কিশোর সংশোধনাগারে তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা একেবারে অল্প হওয়া সত্ত্বেও আমি সেখানে ঢোকার ছাড়পত্র পাইনি, অথচ হঠাৎ আল্লাহ ﷻ আমাকে বাইরের মুক্ত পৃথিবী থেকে একেবারে ফেডারেল জেলের বাসিন্দাদের মাঝখানে নিয়ে আসলেন। আর আমি দিনরাত সব সময় তাদের তালিম দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

আলহামদুলিল্লাহ যেখানেই তারা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিটি জেলেই আমি তালিম দিয়েছি। প্রতিটি জেলে একদল মুসলিমকে কুরআন-সুন্নাহ এবং ঈমানের

মৌলিক ভিত্তিগুলোর সাথে পরিচিত করিয়েছি। তাদের মধ্যে অনেকে কুরআন হিফয করেছেন। যারা আরবিতে একটি শব্দও বলতে পারতেন না, তারা এক বছরেরও কম সময়ে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছিলেন এবং আরবিতে কথা বলা শিখেছিলেন। আমরা দিনরাত পড়াশোনা করতাম। তাওহিদের কিতাবগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তাম। আমরা শিখছিলাম ইলম শেখার নিয়মতান্ত্রিক, সনাতন পদ্ধতি অনুযায়ী। যে পদ্ধতিতে সালাফ আস-সালিহিন এবং পূর্ববর্তী আলিমগণ ইলম অর্জন করতেন। এখনকার ওদের মতো না যারা দিন দুয়েক বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন পড়াশোনা করে নিজেদের শাইখ ভাবা শুরু করে। সিরাহ, ফিকহ, আরবি—আল্লাহর ﷻ ওয়াস্তে তালিব, অধ্যয়ন আর পড়ার ফাঁকের বিশ্রাম, এভাবেই আমাদের সময় কাটত।

জেলখানার কর্মকর্তারা এ দাওয়াহর প্রভাব লক্ষ করল। তারা নানাভাবে আমাকে হয়রানি করার চেষ্টা শুরু করল। বারবার আমাকে এক জেল থেকে অন্য জেলে পাঠাত। দুই পা আর কোমরে শেকল পরানো। হাত নাড়ানো যায় না, কারণ কোমরের শেকলের সাথে হ্যান্ডকাফ আটকে দেওয়া। এভাবেই বাস আর বিমানে করে এক কারাগার থেকে আরেক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হতো। দিনের পর দিন এভাবেই কাটত প্রতিটি মুহূর্ত। আপনি জানেন না আপনার পরিবারের মানুষগুলো কেমন আছে, কোথায় আছে। আপনি জানেন না বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে। এমন অবস্থায় অনেকেই প্রশ্ন করে বসে, হে আল্লাহ ﷻ কেন আপনি আমার সাথে এমন করছেন! আমার কী অপরাধ ছিল? আমি তো কেবল কুরআন পড়াচ্ছিলাম।

কিন্তু আমি কি বলতে পারি—আল্লাহ ﷻ আপনি আমার সাথে এমন কেন করলেন, আমি তো তাদের কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলাম? একজন মুমিন এ ধরনের কথা বলতে পারে না। আমরা অনেক সময়ই কোনো পরিস্থিতির পেছনে আল্লাহর ﷻ হিকমাহ অনুধাবন করতে পারি না। অনেক সময় আমাদের প্রতিকূলতা, বিপদ ও কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু এর পেছনের পরিকল্পনা, এর পেছনের হিকমাহ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কখনো হয়তো কোনো ঘটনার অন্তর্নিহিত হিকমাহ আপনি সাথে সাথেই বুঝতে পারবেন। কখনো হয়তো ঘটনা ঘটে যাবার কিছুদিন পর বুঝতে পারবেন। আবার হতে পারে আল্লাহর ﷻ সামনে দাঁড়াবার দিনটির আগপর্যন্ত আপনি কোনো ঘটনার অন্তর্নিহিত হিকমাহ বুঝবেন না। তাই আমাদের এমন প্রশ্ন করা উচিত না, এমন কোনো কিছু বলা উচিত না। আমার মনে হয়েছিল কোনো একটি নির্দিষ্ট জেলে থাকার চেয়ে বরং জেল থেকে জেলে স্থানান্তরই ভালো। এতে করে আমি যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে বন্দী এমন অসংখ্য মানুষকে দেখার ও তাদের সাথে মেশার সুযোগ পেয়েছি, যা অন্য কোনোভাবে আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হতো

না। যেখানেই যেতাম, প্রতিবার সেই একই রুটিনের পুনরাবৃত্তি—কুরআন, তাওহিদ, সিরাহ্ ও ফিকহ্। প্রতিবার সেই একই পাঠ্যক্রম। অনেকেই বলত— আমাদের এ সিলেবাসটি লিখে দিন, যাতে আপনি চলে গেলেও আমরা এটা চালিয়ে যেতে পারি।

একটা পর্যায়ে তারা আমাকে সলিটারি কনফাইনমেন্ট বা নির্জন কারাবাসে দিলো। নয় মাস একাকী একটি ছোট্ট সেলে কাটালাম। কেন আমাকে এই শাস্তি দেওয়া হলো? কারণ, "এই লোককে ইসলাম শেখাতে দেওয়া যাবে না"। আমাকে যে জেলে রাখা হয়েছিল সেখানকার সলিটারি সেলগুলো ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জঘন্য সলিটারি সেলগুলোর অন্যতম। কারণ, জেলটি বানানোর সময় সলিটারি সেল রাখার পরিকল্পনা ছিল না। কারাগারটি ছিল ১৯৩০ এর দিকে বানানো পুরোনো ধাঁচের বিল্ডিং। এমনিতেই এখানে থাকা ছিল বেশ কঠিন। আর এ জেলের সলিটারি বা নির্জন কারাবাসের জন্য নির্ধারিত অংশের অবস্থা ছিল আরও জঘন্য।

কোন অপরাধে আমাকে এমন একটি জায়গায় রাখা হলো? কারণ, আমি অন্যান্য কয়েদিদের ইসলাম শেখাচ্ছিলাম। আর আমাকে সলিটারিতে রাখার জন্য যে ব্যক্তি জেল কর্তৃপক্ষকে উসকানি দিয়েছিল এবং আমার সম্পর্কে লিখিত রিপোর্ট দিয়েছিল, সে ছিল একজন মুসলিম এবং কারাগারের ইমাম! আল্লাহর শপথ, ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মযাজকেরাও এই মুসলিম ইমামের চেয়ে আমার ব্যাপারে বেশি সমব্যথী ও অনুতপ্ত ছিল। সে আমার বিরুদ্ধে উসকানি দিত, নির্যাতন চালাত আবার দিনশেষে বলত, সে একজন সালাফি!

এই জেলে এমন কিছু গার্ড ছিল যারা এর আগে অ্যামেরিকান বাহিনীর হয়ে ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে। এদের অনেকেরই যুদ্ধের বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। এরা মুসলিম বন্দীদের ওপর ঝাল ঝাড়তে চাইত। অথচ এই গার্ডরাও এই তথাকথিত মুসলিম ইমামকে বলত আমাকে আর আমার বাবাকে যন্ত্রণা দেওয়া বন্ধ করতে। আমাদের প্রতি এই লোকের আচরণ এতটাই খারাপ ছিল যে, ইহুদি র‍্যাবাই আর খ্রিষ্টান পাদরিরাও একপর্যায়ে তার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানায়। অথচ এই ইমাম একবার নিজ থেকেই আমাকে জানিয়েছিল তার সাবেক স্ত্রী ও মেয়ে এক সময় আমার বাবার বেশকিছু ক্লাস এবং আমার দুটো ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছিল। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি অমুককে চেনো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে বলল, এই দুই জন তার সাবেক স্ত্রী ও মেয়ে এবং তারা আমার ছাত্রী ছিল। সুবহানাল্লাহ! অথচ এই মুসলিম ইমামই জেল কর্তৃপক্ষকে বলেছিল যে, জেলে

আমাকে পড়ানোর সুযোগ দেওয়া উচিত না। আর তার এ কথার কারণে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে সলিটারি সেলে নিয়ে রেখেছিল।

এ গল্প বলার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো—আমার কয়েক সেল পরেই এক মুসলিম ভাইকে রাখা হয়েছিল। অন্য একটি কারণে তিনি জেল খাটছিলেন।[১৫] কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ﷻ তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। আমাদের সেল দুটো খুব কাছাকাছি ছিল, আর আমার বাবা ছিলেন ওপরে দোতলায়। সত্তর বছর বয়সেও তাঁকে সলিটারি সেলের বন্দিত্বের কষ্টের মাঝ দিয়ে যেতে হচ্ছিল।

নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এ ভাইটি একদিন ভোরে হাতের কবজি চিরে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। সময়মতো গার্ডরা পৌঁছে যাওয়ায় সে যাত্রায় ভাইটি বেঁচে যান; আলহামদুলিল্লাহ। তিনি কেন এমন করেছিলেন—এ-জাতীয় কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। এগুলো না বলে বরং বলুন, হে আল্লাহ তাকে এবং এ রকম অন্যান্য ভাইদের হিদায়াতের ওপর অবিচল রাখুন এবং তাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

সলিটারি সেলে থাকা আসলে কতটা কষ্টের সেটা বোঝানোর জন্য সেল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিই। সেলটা আকারে অত্যন্ত ছোট। একটি বেড, একটি কমোড আর একটি বেসিনসহ পুরো সেল আকারে একটি মাঝারি সাইযের বিছানার (কুইন সাইয বেড) চেয়েও ছোট। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ছোট সেলের ভেতরে দিনের তেইশ কিংবা পুরো চব্বিশ ঘণ্টাই কাটাতে হতো। শীতের কবল থেকে বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। গরমকালেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই সেল ব্লকে মোট বিশ জনের মতো কয়েদিকে রাখা হতো। প্রত্যেকের জন্য আলাদা সেল। যে নয় মাস আমি সেখানে ছিলাম, এর মাঝে সেখানকার দুজন বন্দী মারা গিয়েছিলেন। সলিটারি সেলে থাকাটা ছিল এতটাই কঠিন।

যা হোক, ভাইটি আত্মহত্যার চেষ্টা করায় জেল কর্তৃপক্ষ বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তারা ভয় পাচ্ছিল হয়তো তারা কোনো আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে আর তখন তদন্তের জন্য বাইরে থেকে বিভিন্ন সংস্থা আসবে। এ মুসলিম ভাইটি তাদের বলল—আমাকে যদি শাইখ আহমাদের সাথে রাখা না হয়, আমি আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা করব। এবার তাকে নিয়ে মোটামুটি সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ওয়ার্ডেন, ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট সবাই মিলে আলোচনায় বসল। তারা বলল—আমরা এই লোককে সলিটারি সেলে রেখেছি যেন সে কাউকে দাওয়াহ দিতে না পারে, অথচ

---

[১৫] দ্বীনের কোনো বিষয়ে নয়

আরেকজন বলছে এই লোকের কাছে তাকে রাখা না হলে সে আত্মহত্যা করবে। আমরা কিছুতেই এটা করতে পারি না। সেই ভাইটি তখন বললেন—তোমরা যদি আমাকে শাইখের সাথে না রাখো, আমি অনশন করব। অবশেষে তারা নতি স্বীকার করল এবং তাঁকে আমার সাথে একই সেলে রাখতে বাধ্য হলো।

আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেখানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটালাম। আমাদের সময় কাটল সালাত, যিকর, পড়া ও শেখানোতে। ইসলাম নিয়ে অগণিত প্রশ্ন ও নিরন্তর আলোচনায়। কেবল ইসলাম নিয়ে কথা বলেই আমরা সময় কাটাতাম। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সেই সেলে আমাদের ঈমান ছিল আকাশচুম্বী, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর তারপর জেলজীবনে পরিচিত হওয়া অন্য আরও অনেক অসাধারণ ভাইয়ের মতোই আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হলো। আল্লাহ ﷻ তাঁর অবস্থা সহজ করে দিলেন। অবশেষে তিনি তাঁর আগের জায়গায় ফিরে গেলেন। আর আমাকে অন্য একটি হাই সিকিউরিটি কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে আমি ফেইসবুকে একটি মেসেজ পেলাম। প্রথমে আমি তাকে চিনতে পারিনি, কিছু প্রশ্নের পর জানতে পারলাম ইনিই হলেন আমার সাথে সলিটারি সেলে থাকা সেই ভাই। আলহামদুলিল্লাহ তিনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি বললেন, ভাই, আমাকে সাহায্য করুন যাতে আমার ঈমানকে জেলখানার সেই দিনগুলোর মতো মজবুত করতে পারি। আমার মনে ছিল না যে, আমি ভাইটিকে একটি মুসাল্লাহ[১৬] দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আপনার দেওয়া মুসাল্লাহটি আমি এখনো সযত্নে আগলে রেখেছি। সেই দিনগুলোর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। আসলে কারাগারের সেই সংকীর্ণ কুঠুরিতে তিনি আমার সাথে সময় কাটাননি। তিনি আল্লাহর ﷻ সাথে সময় কাটিয়েছেন, আল্লাহর ﷻ নৈকট্য অর্জন করেছিলেন। এখন তিনি একজন স্বাধীন মানুষ, কিন্তু বাইরের পৃথিবীর স্বাধীনতার চেয়ে তাঁর কাছে কারাগারের সেই মধুর স্মৃতি আর বিশুদ্ধ ঈমানের স্বাদকেই বেশি প্রিয় মনে হচ্ছে।

তাই মনে রাখবেন, অনেক সময় বিপদ ও পরীক্ষার অন্তর্নিহিত হিকমাহ উপলব্ধি করা না গেলেও আল্লাহর ﷻ তরফ থেকে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সব সময় সন্তুষ্ট ও খুশি থাকবেন।

---

[১৬] জায়নামায

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ—রাতের সন্ন্যাসী, মঙ্গোল ও তাতারদের বিরুদ্ধে ময়দানের যোদ্ধা, সেনাদলের অধিনায়ক, সুন্নাহর পুনরুজ্জীবক। তিনি বিদআহ থেকে সুন্নাহকে পৃথক করেছিলেন, মানুষের সামনে সুন্নাহর সীমারেখা স্পষ্ট করেছিলেন এবং মূলোৎপাটন করেছিলেন দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা সব ধরনের বিদআহর। তিনি ছিলেন সালাফুস সালিহিনের মানহাজের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, বিদআতি ও পথভ্রষ্টদের দমনকারী। আর এ কারণেই তাঁকে সালাফদের মতোই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ মোট সাত দফায় নবি ইউসুফের ﵇ পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছিলেন এবং কারাগারেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রতিবারই তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল শত্রুতাবশত। শত্রুরা তিনটি কারণে তাঁকে বন্দী করেছিল—হিংসা, শাসক ও ক্ষমতাশীলদের নৈকট্য পাবার আকাঙ্ক্ষা, অথবা সত্যকে মেনে নিতে তাদের অপারগতা। তাঁর সাথে তর্কবিতর্কে পেরে উঠতে না পেরে শেষ অবলম্বন হিসেবে তারা চাইত তাঁকে কারারুদ্ধ করতে। আজও আমাদের চারপাশে অনেক আলিম একই আচরণ করে। তারা আজও একই কৌশল অবলম্বন করছে এবং ভবিষ্যতেও এমনটাই করবে। গোমরাহি ছড়াতে ইচ্ছুক বিদ্বেষপূর্ণ আলিমগণ যখন দলিলের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না, তখন যেকোনো মূল্যে নিজেদের রাস্তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। তাদের যখন বলা হয়, "এসো, আমরা মানুষের সামনে আকিদাহ ও আকিদাহ নিয়ে তোমাদের বিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি নিয়ে বিতর্ক করি"—তারা শাসক ও ক্ষমতাশীলদের চাপ দেয়, তাদের প্রতিপক্ষকে বন্দী ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য। 'ইলমের ঘাটতি ও অক্ষমতার কারণে হকপন্থীদের মুখোমুখি হতে তারা রাজি হয় না। কারণ, তারা ইলমের মিসকীন। প্রকৃত ইলম কী, তারা জানে না।

ইবনু তাইমিয়্যাহ رحمه الله প্রথমবার বন্দী হন ৬৯৩ হিজরিতে। আসসাফ আন-নাসরানি নামের এক খ্রিষ্টান রাসূলুল্লাহর ﷺ অবমাননা করেছিল। এ ঘটনার পর ইবনু তাইমিয়্যাহ সেই সময়কার আরেকজন বিখ্যাত আলিম যায়নুদ্দিন আল-ফারিকির رحمه الله সাথে দেখা করেন। আল-ফারিকি ও ইবনু তাইমিয়্যাহ সেই এলাকার শাসক আমির ইযযুদ্দিন আল-হামাউয়ির কাছে যান এবং তাকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে বললেন, আসসাফ নামের এক লোক রাসূলুল্লাহকে ﷺ গালি দিয়েছে, সুতরাং আপনি তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন। আমির আশ্বাস দিলেন, তিনি বিষয়টি দেখবেন।

আমিরের সাথে কথা শেষে ইবনু তাইমিয়্যাহ ও তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজন ফিরে আসছিলেন। এ সময় তাঁরা আসসাফ ও তাকে আশ্রয় দেওয়া মুসলিম লোকটিকে আসতে দেখলেন। বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল এবং একপর্যায়ে আসসাফের সাথে থাকা মুসলিম লোকটি অন্য মুসলিমদের লক্ষ্য করে বলল, "এই খ্রিষ্টান লোকটি তোমাদের চেয়ে ভালো।" ব্যস, সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল দুদলের মধ্যে পাথর ছোড়াছুড়ি ও মারামারি। আসসাফ ও তার আশ্রয়দাতা জানে বেঁচে গেলেও বেদম মার খেলো। এ ঘটনার জন্য দায়ী করা হলো ইবনু তাইমিয়্যাহ ও আল-ফারিকিকে। তাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো এবং তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হলো। অন্যদিকে খ্রিষ্টান লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া হলো, কারণ বন্দী হবার পর সে দাবি করছিল সে মুসলিম হয়ে গেছে।

**ইবনু তাইমিয়্যাহর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো কী ছিল?**

সহিংসতা, গোলযোগ সৃষ্টি, বেআইনিভাবে আক্রমণ, হত্যাচেষ্টা—আজকের আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোকে এ ধরনের অনেক নাম দেওয়া যেতে পারে। গভর্নর, শাসকগোষ্ঠী ও জনগণ ইবনু তাইমিয়্যাহর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ ছড়িয়েছিল আর এসব শুনে মূর্খরা বলাবলি করত, "ওহ! তিনি তো ওই লোককে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, তাই তাকে দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছে"।

পরে আমির নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন। তিনি ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং তার বন্ধু আল-ফারিকির কাছে ক্ষমা চান এবং তাঁদের মুক্ত করে দেন। এই ঘটনার ঠিক পর পরই জানা গেল, আসসাফ আর তার ভাগ্নের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, আর একপর্যায়ে তার ভাগ্নে তাকে হত্যা করেছে। এ ঘটনার পর মানুষ বলতে শুরু করল, এটা হলো ইবনু তাইমিয়্যাহর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রমাণ। কারণ, আসসাফ ইবনু তাইমিয়্যাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। সে ইবনু তাইমিয়্যাহর ক্ষতি করতে চেয়েছিল, তাই আল্লাহ ﷻ ভাগ্নের হাতে তার মৃত্যুর মাধ্যমে এর সমুচিত জবাব দিয়েছেন।

এই বন্দিত্বের ফলাফল হিসেবে কী পাওয়া গেল? বন্দিত্বের এই অল্প সময়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ একটি অবিস্মরণীয় বই লিখলেন, *আস-সারিমিল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল*।[১১] গত সাত শতাব্দীজুড়ে এই গ্রন্থটি রাসূলুল্লাহর ﷺ অবমাননাকারীর ব্যাপারে বিধানের ব্যাপারে সঠিক অবস্থানের প্রতীক ও চূড়ান্ত বিশ্বকোষ হিসেবে ইসলামি বিশ্বে স্বীকৃত। বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের আলোকে এ বিষয়ের আহকামগুলো এ বইতে অত্যন্ত বিস্তারিত ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যার কারণে রাসূল ﷺ অবমাননা নিয়ে লেখা বইগুলোর মাঝে এটিই সর্বোত্তম বলে বিবেচিত। যদি খিলাফাহ থাকে আর খলিফা বা বিচারক রাসূলুল্লাহকে ﷺ গালি প্রদানকারীর বিধান জানতে চায়, তবে তাদের বইটি বাছাই করতেই হবে। এই বইটি আজও আমরা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করি। *আল ফাতাওয়া*-তেও এটি আছে এবং প্রায় প্রত্যেক তালিবুল ইলমের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই কিতাবটি রয়েছে।

৭০৫ হিজরির ২৬ রমাদ্বান। দ্বিতীয়বারের মতো ইবনু তাইমিয়্যাহ বন্দী হলেন। এবার কায়রোতে। তাঁর সাথে আটক করা হলো তাঁর দুভাই আবদুল্লাহ ؒ, আব্দুর রহমান ؒ এবং তাঁর ছাত্র ইবরাহিম আল-গাইয়ানিকে ؒ। তিনি যেখানেই যেতেন, সব সময় এই তিন জনকে সাথে রাখতেন। তাই তাঁদেরও বন্দী করা হলো।

এবার তাঁকে বন্দী করা হলো আল্লাহ ﷻ, আল্লাহর আরশ, আল্লাহর কালাম এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহর অবতরণের (নুযুল) ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাসের কারণে। অর্থাৎ আল্লাহর যাত ও সিফাত-সংক্রান্ত বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে। অথচ এ বিষয়ে সালাফরা যে আকিদাহ রাখতেন ইবনু তাইমিয়্যাহও ঠিক একই আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আপনি কি মনে করেন তাঁদের আটক করার পর বলা হয়েছিল, "আমরা এমন চার জনকে আটক করেছি, যারা আকিদাহর স্বার্থে লড়াই করছেন। এমন চার জনকে আটক করেছি, যারা সাহাবিদের ؓ পথের ওপর অবিচল আছেন এবং আল্লাহর ﷻ যাত ও সিফাতের ব্যাপারে ঠিক সেই অবস্থান নিয়েছেন যা সাহাবিগণ ؓ নিয়েছিলেন?"

না, বরং বলা হয়েছিল—"আমরা এমন চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছি যারা আল্লাহর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তাঁর মর্যাদাহানি করেছে। ইবনু তাইমিয়্যাহ তাদের একজন"। ইবনু তাইমিয়্যাহ সম্পর্কে তাদের মিডিয়া প্রপাগান্ডা ও চলমান সরকারি বিবৃতির কথা ভাবুন। যে বিশাল জনগোষ্ঠী এই কথাগুলো শুনছিল, তারা মনে করছিল—এই চার উন্মাদ মহান আল্লাহর অসম্মান করেছে,

---

১১ রাসূলের ﷺ অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে উন্মুক্ত তরবারি

সুতরাং কারাগারই তাদের উপযুক্ত স্থান। লোকজন তাঁদের অভিশাপ দিচ্ছিল। তাঁরা অমঙ্গল কামনা করছিল। সে সময় ইবনু তাইমিয়্যাহ ও তাঁর সঙ্গীদের মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন সমর্থক ছিল।

মুক্তির পর অন্যায়ভাবে তাঁদের বন্দী করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ইবনু তাইমিয়্যাহর ভাই আবদুল্লাহ আল্লাহর ﷻ দরবারে দু'আ করলেন। কিন্তু ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁকে বললেন, "বরং বলো—হে আল্লাহ, তাদের নুর দান করুন এবং সত্যের পথে চালিত করুন। তাদের বিরুদ্ধে বদদু'আ কোরো না; বরং তাদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করো।" ইবনু তাইমিয়্যাহ ছিলেন এমনই ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

৭০৭ হিজরিতে ইবনু তাইমিয়্যাহ তৃতীয়বারের মতো কারারুদ্ধ হন। ইস্তিগাসার[18] ওপর লিখিত একটি বইয়ের কারণে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কায়রোর সুফিরা দলবেঁধে শাসকদের কাছে গিয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহকে বন্দী করার জন্য পীড়াপীড়ি করা শুরু করে। প্রথমবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আইন ভাঙা ও মানহানির। দ্বিতীয়বার আল্লাহর ﷻ অবমাননা, আর তৃতীয়বার তাঁকে গ্রেফতার করা হলো রাসুলুল্লাহর ﷺ অবমাননার অভিযোগে।

ভ্রান্ত সুফিরা সব সময় প্রশাসনের পদলেহনে ব্যস্ত থাকে। আজকেও এমন লোকের সংখ্যা অনেক। এসব লোক সব সময় মিথ্যাবাদী হয়। যখন যে সরকার আসে এরা সেই সরকারের তোষামোদ করে, ফলে সরকারের কাছ থেকে এরা আদর-যত্ন পেয়ে থাকে। সরকারগুলোর কাছে আর কোনো গোষ্ঠী সুফিদের মতো প্রিয় না। কারণ আকিদাহ, শরয়ি জ্ঞান, আল্লাহ ﷻ ও রাসুলের ﷺ ব্যাপারে সঠিক বিশ্বাস—কোনো কিছুই তাদের মাঝে নেই।

হিশাম কাব্বানি[19] অ্যামেরিকায় কী করেছিল মনে করে দেখুন। ১৯৯৯ সালেই কাব্বানি অ্যামেরিকান সরকারকে বলেছিল, অ্যামেরিকার আশি শতাংশ মসজিদ "চরমপন্থীরা" নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে যা ঘটছে, যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তারও আগে থেকে সে অ্যামেরিকান সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছিল সব মসজিদ বন্ধ করে দেওয়ার। সে সরকারকে বলেছিল, যুক্তরাষ্ট্রে যেসব মুসলিমরা থাকে, তারা চরমপন্থী। ২০০১-এর ঘটনার আগেই সে অ্যামেরিকার মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্দেহ আর

---

[18] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট গায়িবি সাহায্য কামনা করা।

[19] বর্তমানে অ্যামেরিকায় বসবাসরত লেবানিজ সুফি। তার পূর্বসূরীদের মতোই কাব্বানি কাফির ও শাসকগোষ্ঠীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাব্বানির একটি ফতোয়া অ্যামেরিকান সামরিক বাহিনী নিজ উদ্যোগে অনুবাদ করে ইরাকে মোতায়েন করা অ্যামেরিকান সেনাদের মধ্যে বিলি করেছে।

নজরদারির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা এখনো এসব করে বেড়াচ্ছে।

আপনার কী মনে হয় ইবনু তাইমিয়্যাহর বিরুদ্ধে এসব সুফিদের অভিযোগের কতটুকু সত্যতা ছিল? এসবই ছিল তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার একটা পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। তারা মানুষের সামনে ইবনু তাইমিয়্যাহর একটি বিকৃত ছবি উপস্থাপন করছিল। "দেখুন, এই লোক মাত্র আল্লাহর ﷻ প্রতি অবমাননার অপরাধে জেল খেটে ছাড়া পেয়েছে, আর এখন সে রাসুলুল্লাহর ﷺ অবমাননা করছে! কীভাবে এমন লোককে সমর্থন করা সম্ভব!"

আপনাদের কী ধারণা, তারা বলেছিল ইবনু তাইমিয়্যাহ হলেন তাওহিদের সংরক্ষণকারী এক মহান প্রহরী? এমন একজন মহান ব্যক্তি যিনি মুসলিম জনসাধারণকে শিরক থেকে দূরে রাখতে চান? তারা কি তাঁকে ইবরাহিমের ﷵ অনুসারী বলেছিল? ইবরাহিম ﷵ বাস্তবে মূর্তি ভেঙেছিলেন, ধ্বংস করেছিলেন। আর ইবনু তাইমিয়্যাহ ইবরাহিমের ﷵ অনুসৃত সেই শিরকমুক্ত বিশুদ্ধ তাওহিদকে পুনর্জীবিত করছিলেন। তিনি তাঁর বইয়ে বলছিলেন—তাওহিদ হচ্ছে গাইরুল্লাহর কাছে এমন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা যা কেবল আল্লাহর ﷻ কাছ থেকেই চাওয়া যায়। মিশরব্যাপী তাঁর 'কুকীর্তি'র খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিপূর্বে তিনি আল্লাহর ﷻ প্রতি অবমাননার দায়ে জেল খেটেছেন, এবার রাসুলুল্লাহর ﷺ প্রতি অবমাননার কারণে গ্রেফতার হয়েছেন—তাদের কৌশলী মিডিয়া প্রপাগান্ডার কারণে ইবনু তাইমিয়্যাহর সম্পর্কে অধিকাংশের ধারণাই ছিল এমন।

হিজরি ৭০৭ সালে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ চতুর্থবারের মতো বন্দী হন। আগেরবারের বন্দিত্ব থেকে তিনি মুক্তি পাবার পর থেকেই সুফিরা ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল। নাসর আল-মানবাযি নামের হুলুলের[৯০] আকিদাহয় বিশ্বাসী এক লোক তৎকালীন শাসক আল হাকিম আল-জাশনকিরের কাছে গিয়ে বলল, আপনি এই লোককে কারাগারে বন্দী করে রাখুন। কোনো অভিযোগ ছাড়াই, কোনো তদন্তের আগেই তাঁকে বন্দী করা হলো। কারণ, তিনি "একজন বিপজ্জনক লোক"। অথচ তিনি কোনো অপরাধ করেননি।

যারা নিজেদের হীনতা ও নীচু মানসিকতাকে স্বীকার করতে পারে না, যারা স্বীকার করতে পারে না যে তারা ডলারের মোহে ইসলামের বদলে কুফর প্রচার করে

---

[৯০] এই আকিদাহ বা বিশ্বাসের মূলকথা হচ্ছে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান। নিশ্চয়ই তারা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র এবং বহু ঊর্ধ্বে।

যাচ্ছে—এমন আলিমগণ কখনোই সত্যের প্রচার ও প্রসারের [illegible] যাওয়া কোনো নেককার বান্দাকে সহ্য করতে পারে না। তাই তারা তাঁকে কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। শাসককে বোঝালো—এই লোক বিপজ্জনক, তাঁকে বন্দী করুন। আর এভাবে আমাদের পথের বাধা দূর করুন। ওয়াল্লাহি, আজও তারা একই কাজ করে যাচ্ছে, আজকেও এক শ্রেণির আলিম একই কৌশল অবলম্বন করছে।

৭০৯ হিজরিতে আবারও ইবনু তাইমিয়্যাহ মিসরে কারারুদ্ধ হলেন। এ ছিল তাঁর পঞ্চম কারাবরণ। আবারও সেই একই লোকদের চক্রান্ত। এ দফায় সাত মাস তিনি বন্দী থাকেন। নাসর আল-মানবাজি ও আল-জাশনকির জোটবেঁধে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। এবার তারা চেষ্টা করল তাঁকে সাইপ্রাসে নির্বাসন দেওয়ার, যাতে চিরতরে তাঁর দাওয়াহ মুছে দেওয়া যায়। তারা তাঁকে মৃত্যু, নির্বাসন ও কারাগারের ভয় দেখাল। আর এ সময়েই ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি উচ্চারণ করলেন। আমরা সবাই এ উক্তিটির সাথে কমবেশি পরিচিত এবং সবাই এটা শুনেছি—

তারা আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখায়। তারা যদি আমাকে হত্যা করে, আমি হব শহীদ। যদি আমাকে নির্বাসনে পাঠায়, তবে সেটা হবে আমার সফর ও হিজরত। আমি আল্লাহর সৃষ্টি অবলোকন করব। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষদের আমি দাওয়াহ দিতে থাকব। আমাকে সাইপ্রাসে পাঠিয়ে দাও, আমি সেখানেও দাওয়াহ দেবো। আর তোমরা যদি আমাকে কারাগারে পাঠাও, তবে সেটা হলো আমার জন্য আল্লাহর যিকরে কাটানোর কাঙ্ক্ষিত নিঃসঙ্গতা। আমি সেখানে কুরআন তিলাওয়াত, ইবাদত ও মুহাসাবার (আত্মপর্যালোচনা) সময় পাব।

তিনি আরও বললেন, "আমি ভেড়ার মতো—সে যেদিকে ফিরেই ঘুমাক না কেন, ভেড়া পশমের ওপরই থাকে।" যার অর্থ হলো, আমি সব সময়ই সুখী, আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। এমন কিছুই নেই, যা দিয়ে তোমরা আমার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহকে বন্দী করে রাখা হলো। তাঁকে নিয়ে কী করা, ভাবতে ভাবতে তারা দিশেহারা হয়ে গেল।

শাইখুল ইসলাম কারাগারে মৃত্যুদণ্ড কিংবা নির্বাসনের জন্য অপেক্ষমাণ। ঠিক এমন সময়ে এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেল। নাসির ইবনু মুহাম্মাদ নামের এক ব্যক্তি তৎকালীন শাসক আল-জাশনকিরকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিলো। ইবনু তাইমিয়্যাহকে যে শাসক বন্দী করেছিল, তাকে হটিয়ে নাসির ইবনু মুহাম্মাদ শাসনভার দখল করল। জাশনকির ও নাসিরের মাঝে দীর্ঘদিন ধরেই সংঘাত চলছিল। একেকবার একেকজন ক্ষমতা দখল করত। নাসির শাসনভারের নিয়ন্ত্রণ পাবার পর

ইবনু তাইমিয়্যাহকে সসম্মানে মুক্তি দিলো। নাসির বলল, আগের সুলতানকে অপসারণ করে আমি শাসনক্ষমতা দখল করেছি; আর আমি আপনাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। আপনি স্বাধীন, যা ইচ্ছা করতে পারেন।

নতুন সুলতান ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের জন্য ইবনু তাইমিয়্যাহকে কাজে লাগাতে চাচ্ছিলেন। ইবনু তাইমিয়্যাহর বিরুদ্ধে যে সুফি আলিমরা ছিল, আর তাদের সাথে যারা জোট বেঁধেছিল, তারাই নাসিরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আল- জাশনকিরকে সাহায্য করেছিল। নাসিরের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করছিল এবং সে চাচ্ছিল ইবনু তাইমিয়্যাহকে সম্মানিত করার মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করতে। সে জানত যে, তাদের দুজনের শত্রু একই। আর তাই সে ভেবেছিল, বিরোধীদের শিরশ্ছেদ করার জন্য এবার হয়তো সে একটি ফাতওয়া পাবে। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কারণে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সে তাদের হত্যা করতে চাইছিল। আর সে ভেবেছিল ইবনু তাইমিয়্যাহর কাছ থেকে এর বৈধতা আদায় করে নেবে, কারণ এই লোকগুলোই ইবনু তাইমিয়্যাহকে কারাগারে পাঠিয়েছিল। অর্থাৎ ইবনু তাইমিয়্যাহর প্রতি তার প্রস্তাব ছিল— "আমাদের দুজনের শত্রু এক। আমার হাতে তলোয়ার আছে, কেবল আপনার ফাতওয়ার অপেক্ষা!"

নাসির ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কালাউন তার প্রতিশোধের বৈধতার জন্য ইবনু তাইমিয়্যাহকে ব্যবহার করতে চাইছিলেন, কিন্তু ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো পর্বতসম মহিরুহরা শাসকদের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যদিও তাদের শত্রু অভিন্ন ছিল, তবুও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ইবনু তাইমিয়্যাহর মনে তাঁর বিরোধিতাকারীদের জন্য কোনোরকম প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা কিংবা বিদ্বেষ ছিল না। আর এমন অনুভূতি লালন করা ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো মানুষের শোভা পায় না। তারা তাঁর সাথে যত কিছুই করুক না কেন, ইবনু তাইমিয়্যাহ জবাবে এমন কখনোই করবেন না। আর এটাই ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহকে তাঁর সময়ের মহান মহিরুহে পরিণত করেছিল। এ কারণেই তিনি শাইখুল ইসলাম নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যে পরিচয় আজ পর্যন্ত বহাল আছে।

পুরো দৃশ্যটি একবার কল্পনা করুন। পরিস্থিতি হঠাৎ পুরোপুরি উল্টে গেছে। শাসক এখন ইবনু তাইমিয়্যাহর পক্ষে। সুলতান তাঁকে বলছেন, আমার কেবল আপনার কাছ থেকে একটা ফাতওয়া প্রয়োজন, আর সাথে সাথে এদের মাথাগুলো ধুলোয় লুটাবে। অথচ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বললেন, এঁরা সবাই শীর্ষস্থানীয় আলিম, এঁদের কেউ কেউ আপনার সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এঁদের চেয়ে উত্তম কাউকে আপনি খুঁজে পাবেন না। আর তাঁরা আমার সাথে যা কিছু করেছেন, সবকিছু আমি মাফ করে

দিয়েছি। তারপর তিনি তাঁদের প্রশংসা করতে শুরু করলেন। যারা এক সময় তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছিল, তিনি তাদের প্রশংসা করলেন।

তাঁর সমকালীন মালিকি মাযহাবের একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন ইবনু মাখলুফ ﵀। এক সময় ইবনু তাইমিয়্যাহর বিরোধিতা করলেও তিনি পরে তাওবাহ করেছিলেন এবং ইবনু তাইমিয়্যাহর মর্যাদা উপলব্ধি করেছিলেন। ইবনু তাইমিয়্যাহর এ বক্তব্যের পর ইবনু মাখলুফ বলেছিলেন, "ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ যাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন আমি সেই লোকেদের একজন। তাঁর চেয়ে বেশি আল্লাহভীরু কোনো মানুষ আমরা দেখিনি। আমাদের হাতে যখন ক্ষমতা ছিল আমরা তাঁর ক্ষতি করার এবং তাঁকে বন্দী করার সব ধরনের চেষ্টা করেছিলাম। এতে আমাদের সাফল্যে আমরা খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু যখন ইবনু তাইমিয়্যাহ ক্ষমতা পেলেন, যখন তাঁর একটি কথা আমাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, তখন তিনি আমাদের জীবন ভিক্ষা দিলেন।" মনে রাখবেন এ কথাগুলো এমন একজন ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এক সময় ইবনু তাইমিয়্যাহকে বন্দী করিয়েছিলেন।

নতুন সুলতান ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহকে দারস-তাদরিস চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দিলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর কোনো বাধা ছিল না। এ সময়টা ছিল তাঁর শিক্ষকতা জীবনের স্বর্ণযুগ। তিনি ব্যাপক পরিসরে জনসাধারণের মধ্যে দাওয়াহ শুরু করলেন। এ পুরো সময়টা জুড়েই অন্যান্য আলিমদের হত্যার ব্যাপারে ফাতওয়া দেওয়ার জন্য সুলতান বারবার তাঁকে অনুরোধ জানাতে থাকলেন। কিন্তু ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ প্রতিবার দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ সব সময় বলতেন, আমি নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করি না, কিন্তু যে আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে অপরাধ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার বদলা নেবেন।

৭২০ হিজরিতে ষষ্ঠবারের মতো ইবনু তাইমিয়্যাহ কারারুদ্ধ হন। তালাকের ওপর একটি ফাতওয়ার কারণে তাঁকে বন্দী করা হয়। তাঁকে ছয় মাস বন্দী করে রাখা হয় তালাকের ব্যাপারে একটি ফাতওয়া দেওয়ার মতো অর্থহীন তুচ্ছ বিষয়ের অজুহাত দেখিয়ে। আপনারা কি মনে করেন, তালাকের মতো ব্যাপারে ফিকহি মতপার্থক্যের কারণে কাউকে বন্দী করা হয়? তাও এমন একটি মতের কারণে যে মত আগেকার অনেক আলিমও পোষণ করতেন? আসলে অজ্ঞরাই এমনটা মনে করে, আর এটা হলো ইতিহাসের ব্যাপারে তাদের ভাসাভাসা ধারণার ফল। বাস্তবতার ব্যাপারে অজ্ঞ হলে আপনিও মনে করবেন যে, তিনি জেলে গিয়েছিলেন তালাকের ব্যাপারে ফাতওয়ার কারণে।

বর্তমান সময়ের কারদাওয়ির মতে—তালাকের ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়্যাহর ফাতওয়া তাঁর সমসাময়িক যুগকে অতিক্রম করে গিয়েছিল, তাই তাঁর সমকালীন লোকজন এই ফাতওয়া মানতে পারেনি; তিনি তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোর যেসব কোর্টে দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিয়ে, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামি শরিয়াহর বিধিবিধান মেনে চলা হয়, সেগুলোর অধিকাংশই ইবনু তাইমিয়্যাহর দেওয়া এই ফাতওয়া অনুসরণ করে। যে ফাতওয়ার অজুহাতে তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল, আজ সেই ফাতওয়াকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এই ফাতওয়ার কারণে তিনি সমাজচ্যুত হয়েছিলেন, তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধে ইজমা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছিল। অথচ আজ তালাকের ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ মাসআলা।[৩]

আসলে তাঁকে বন্দী করার কারণ তালাকের ফাতওয়ার ছিল না; বরং প্রকৃত কারণ ছিল এর চেয়েও বিরাট কিছু। প্রাচীন চার ইমামের মতের বিপরীতে গিয়ে তিনি ফাতওয়া দিয়েছিলেন—এটা তাঁর বন্দিত্বের মূল কারণ ছিল না। প্রকৃত কারণ হলো, জনসাধারণের মধ্যে ইবনু তাইমিয়্যাহর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলছিল। যে কারণে আলিমদের একটি দল তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। আর শুধু আলিমরাই না, শাসকরাও তাঁকে নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

সবাই ইবনু তাইমিয়্যাহর হালাকাহয় যাচ্ছে। দলে দলে মানুষ তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছে। যখন অন্যান্য আলিমগণ এমনকি শাসকরাও রাস্তায় বের হচ্ছেন, তাদের পেছনে এত লোক সমাগম হচ্ছে না, যত মানুষ ইবনু তাইমিয়্যাহর হালাকাহয় যাচ্ছে। সুতরাং, ফালতু কোনো অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দাও! এটাই হলো যালিম আর তাগুত শাসকদের রীতি।

কারাগারে থাকাকালীন তিনি অনেকগুলো বই লিখেছেন। এর মাঝে তালাকের ওপর দেওয়া তাঁর ফাতওয়া নিয়ে সংশয় নিরসনমূলক বইটি বেশ উল্লেখযোগ্য। এ বইটি আজ পর্যন্ত বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

---

[৩] এই বিষয়ে জমহুর মত হল একসাথে কেউ তিন তালাক দিলে সেটা বৈধ তালাক হিসেবেই গণ্য হবে। তিন তালাকের মাসআলায় ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ﵀ চার মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতের বাইরে গিয়েছিলেন। তবে যেমনটা শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল বলেছেন, এ ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়্যাহর আগেও সাহাবা ﷺ ও সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ এই একই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে আরো জানতে দেখতে পারেন -https://islamqa.info/en/36580,
https://islamqa.info/ar/36580,
এবং https://islamqa.info/en/45174, https://islamqa.info/ar/45174

সপ্তম ও শেষবারের মতো তিনি বন্দিত্ব বরণ করেন ৭২৬ হিজরিতে। তাঁকে দামেস্কে বন্দী করে রাখা হয় এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ আল-হিন্নায়ি নামের এক লোককে নিয়ে ফাতওয়া দেন। এ ছাড়াও তিনি ফাতওয়া দেন যে তিনটি মসজিদ[২২] ছাড়া আর কোনো জায়গার উদ্দেশ্যে সওয়াবের নিয়্যাতে (ইবাদত হিসেবে) সফর করা যাবে না। পূর্ববর্তী চার ইমামের মত থেকে একটি মতকে সঠিক গণ্য করে তিনি এ ফাতওয়া দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি ইমাম শাফিয়ি ﷺ ও ইমাম আহমাদের ﷺ, ওই মতও উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে তারা তিনটি মসজিদ ছাড়াও সফরের বৈধতার কথা বলেছেন। তবে নিজে হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের মতকে গ্রহণ করেছিলেন। আর এ কারণেই তাঁকে কারাবরণ করতে হয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ এ বন্দিত্বের সময়ে তাঁর উস্তাদের কাছ থেকে অনেক উপকৃত হন। তালাকের ফাতওয়ার মতো এবারও ফাতওয়া ছিল অজুহাতমাত্র। ইবনু তাইমিয়্যাহকে বন্দী করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। মানুষের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁকে কারাগারে পাঠানো হলো, কিন্তু সেখানেও তিনি দারস-তাদরিসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তারা দেখল যে এতেও কোনো লাভ হচ্ছে না, তখন তাঁকে সলিটারি বা নির্জন কারাবাস দেওয়া হলো। নির্জন কক্ষে বসেই ইবনু তাইমিয়্যাহ লেখালেখি চালিয়ে গেলেন। তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল কারারক্ষীরা গোপনে তাঁর ছাত্রদের কাছে এ লেখাগুলো পৌঁছে দিত।

শেষ বন্দীজীবনে তিনি অনেকগুলো বই লেখেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর ছাত্রদের কাছ থেকে জানা যায়, তিনি সব সময় স্মৃতি থেকে লেখতেন। তাঁর লেখা এত এত বইয়ের এতগুলো খণ্ডে যত তথ্য আছে, সব তাঁর স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে লেখা। তাঁর কাছে ইন্টারনেট ছিল না, সহায়িকা হিসেবে কোনো লাইব্রেরিও ছিল না। এ তথ্যভান্ডার, এ ইলমের পুরোটাই ছিল তাঁর মস্তিষ্কে সঞ্চিত।

নির্জন কারাবাসও তাঁকে আটকাতে পারল না। তিনি লেখালেখি অব্যাহত রাখলেন। তাঁর লেখা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে যেতে থাকল। শাসকরা আদেশ জারি করল—ইবনু তাইমিয়্যাহর কাছে লেখার কাগজ-কলম যা কিছু আছে, সব ছিনিয়ে নেওয়া হোক! তাঁকে যেন লেখালেখির কোনো সুযোগ না দেওয়া হয়।

[২২] মাসজিদ আল-হারাম, মাসজিদ আন-নববী, মাসজিদ আল-আকসা

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "এতকিছুর পরও তারা যখন তাঁর মুখের ওপর সজোরে দরজা লাগিয়ে দিত, তাঁর চেহারাতে খুশির ছাপ দেখা যেত। আর তিনি বলতেন,

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

'অতঃপর উভয় দলের মাঝে দাঁড় করানো হবে একটি প্রাচীর, যার দরজার ভেতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব।'[২৩]

যেই দিন মুনাফিক ও কাফিররা বিতর্ক করবে এবং মুনাফিকরা বলবে, আমাদেরও কিছু আলো দাও যাতে আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারি। মুমিনরা বলবে, পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলোর সন্ধান করো। মুমিনরা সেদিন তাদের নিয়ে উপহাস করবে। আর এ বিতর্ক চলাকালীনই মুমিন ও কাফিরদের মাঝখানে একটি প্রাচীর দিয়ে দেওয়া হবে, যার ভেতরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলছেন, আমার কারাকক্ষের ভেতরে আছে রহমত আর এর বাইরে হলো আযাব। তোমরা আযাবের মধ্যে আছো কিন্তু আমি তো আছি রহমতের মাঝে। তোমরা যখন সজোরে দরজা লাগিয়ে দাও, আমার এ অন্ধকার কারাকক্ষেই আমি যেন সেই রহমত ও জান্নাতকে অনুভব করি। ইবনু তাইমিয়্যাহ তাদের বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তোমরা যদি এই অনুভূতি সম্পর্কে জানতে তবে তোমরা আমার অবস্থানে থাকার কামনা করতে। যারা আমার দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছো, তোমরাই তো মূলত আযাবের মাঝে অবস্থান করছ। এটাই ছিল ওই আয়াত উচ্চারণের মর্মার্থ। তোমরা ভাবছ আমাকে শাস্তি দিচ্ছ, কিন্তু এ কারাগারের মধ্যেই আছে আমার কাঙ্ক্ষিত রহমত, আমার হৃদয়ের সুখ ও প্রশান্তি।

তিনি তাদের বলতেন,

مَا يَصْنَعُ بِي أَعْدَائِي؟ إِنَّ جَنَّتِي وَبُسْتَانِي فِي صَدْرِي

শত্রুরা আমার কী ক্ষতি করবে? আমার জান্নাত তো আমার হৃদয়ে।

إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَا يَدْخُلُ جَنَّةَ الْآخِرَةِ

[২৩] সূরা আল হাদিদ, ৫৭ : ১৩

দুনিয়ার জীবনেও একটি জান্নাত আছে। যে এই জান্নাতে প্রবেশ করেনি, সে পরকালীন জান্নাতেও প্রবেশ করবে না।[২৪]

এত পার্থিব দুর্ভোগ সত্ত্বেও তিনি হৃদয়ে জান্নাতের প্রশান্তি অনুভব করতেন। নির্জন কক্ষের বন্দীজীবনকে তাঁর কাছে জান্নাত মনে হতো, কারণ অন্তরের প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তিই হচ্ছে দুনিয়ার জান্নাত।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

'আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন।'[২৫]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ رحمه الله তাঁর শেষ বক্তব্য লিখেছিলেন কয়লা দিয়ে। মৃত্যুর দুই কি তিন মাস আগে। সহজ-সরল, সংক্ষিপ্ত একটি বক্তব্য। তিনি লেখেন,

"আমার প্রকাশিত লেখনীর কারণে তারা আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তারা চায় না এগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক। আল্লাহ আমার কাজগুলো ছড়িয়ে দেবার মাধ্যমে আমার ওপর দয়া করেছেন আর এটি আল্লাহর তরফ থেকে আমার প্রতি নাযিলকৃত শ্রেষ্ঠ রহমতগুলোর একটি। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ, তাই আমি তোমাদের যে ইলম শিখিয়েছি, তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দাও।"

তারপর এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি করেন :

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

'যা কিছু কল্যাণ, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর যা কিছু অকল্যাণ তা হয় আপনার নিজের পক্ষ থেকে।'[২৬]

এটাই ছিল তাঁর শেষ লেখা। মৃত্যুর প্রায় এক মাস আগে ইবনু তাইমিয়্যাহকে বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় সব ধরনের

---

[২৪] *আল ওয়াবিলুস সাইয়িব মিনাল কালামিত তাইয়িব : ১/৫৭*

[২৫] সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : ১১

[২৬] সূরা আন-নিসা, ০৪ : ৭৯

যোগাযোগব্যবস্থা। যখন তারা দেখতে পেল তিনি গোপনে কয়লা দিয়ে দেয়ালে লিখছেন, সেটাও বন্ধ করে দিলো। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁকে কতটা কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। পুরো জীবন জুড়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল মানুষকে শেখানো, কিন্তু তারা তাঁকে এমনভাবে আবদ্ধ করল যে দাওয়াহর কোনো উপায়ই আর তাঁর সামনে খোলা থাকল না।

একজন দা'ঈর জন্য এটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। দাওয়াহ একজন সত্যিকার দা'ঈর রক্ত, শিরা-উপশিরা ও হৃৎস্পন্দনে মিশে থাকে। যখন ইবনু তাইমিয়্যাহর সাথে তাঁর ছাত্রদের সব যোগাযোগ করার পথ বন্ধ করে দেওয়া হলো, আমার ধারণা সে সময় তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি কাটিয়েছেন। এ সময়ই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। তাঁর মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে শাসকরা ইবনু তাইমিয়্যাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে শুরু করল। তারা গোপনে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর সাথে দেখা করে ক্ষমা চাইত। বলত, আমরা আপনার ওপর যুলুম করেছি, দয়া করে আমাদের ক্ষমা করে দিন।

এরপর কী হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই, তবে শাসকরা তাঁর কাছে যাওয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রায় এক মাসের ব্যবধানেই ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ ﷻ তাঁর ওপর রহম করুন।

ইবনু আব্দিল হাদি ৰহ., ইবনু রজব হাম্বলি ৰহ. ও *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে* ইবনু কাসির ৰহ. বলেছেন—শেষ বন্দীজীবনে ইবনু তাইমিয়্যাহ আশি থেকে একাশিবারের মতো পবিত্র কুরআন খতম করেন।[৩৭] তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে, তিন জন বিখ্যাত আলিমের সূত্রে জানা যায় শাইখুল ইসলাম সর্বশেষ কুরআনের যে আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন তা হলো :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

'আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে, যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি মালিকের সান্নিধ্যে।'[৩৮]

---

[৩৭] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*

[৩৮] সূরা আল কামার, ৫৪ : ৫৪-৫৫

এটাই ছিল তাঁর উচ্চারিত সর্বশেষ আয়াত। এই আয়াতে তিনি যেন তাঁর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছিলেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ মৃত্যুবরণ করলেন। মিনারে ইবনু তাইমিয়্যাহর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হলো। আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার, মতান্তরে পাঁচ লাখ লোক তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ইতিহাসে এমন জানাযা আর কখনোই দেখা যায়নি। এর সাথে কেবল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের জানাযার তুলনা করা যেতে পারে। যারা তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল, তারা ছাড়া সবাই জানাযাতে শরিক হয়েছিল। এমনকি তারাও জানাযায় অংশগ্রহণের করতে চাচ্ছিল, কিন্তু তারা আশঙ্কা করছিল ক্ষিপ্ত জনগণ তাদের হত্যা করে ফেলবে।

ইবনু তাইমিয়্যাহর বারবার কারাবরণের ফলাফল কী? তিনি কারাগারে গিয়েছিলেন আহমাদ ইবনু তাইমিয়্যাহ হয়ে, আর বের হয়েছিলেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ হয়ে। তাঁর শিক্ষা থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। কারাগারে বসেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাকর্মগুলোর অনেকগুলো। তাঁর গ্রন্থাবলি আজকের যুগেও অনন্য হয়ে আছে। যেকোনো বিষয়ের ওপর ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো করে লিখতে পারে, এমন কেউ নেই। দূরদূরান্ত থেকে আসা লোকেরা কারাগারের ভেতরে ঢুকে ইবনু তাইমিয়্যাহর কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে চাইত। কারাদণ্ড শেষ হয়ে যাবার পর অনেক বন্দী অনুনয় করত ইবনু তাইমিয়্যাহর সাথে কারাগারেই থেকে যাবার।

আল্লামাহ ইবনু দাকিকুল ঈদ ﵀ বলেন,

رَأَيْتُ الْعُلُوْمَ كُلَّهَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

'তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, ইলমের মহাসমুদ্র যেন তাঁর চোখের সামনেই আছে।'

يَأْخُذُ مَا يُرِيْدُ وَيَدَعُ مَا يُرِيْدُ

'তিনি যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করেন এবং যেটা ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।'

অর্থাৎ, ইলমের সব শাখাই ইবনু তাইমিয়্যাহর নখদর্পণে ছিল, তাঁর ইন্টারনেটের কোনো প্রয়োজন ছিল না, লাইব্রেরির দরকার ছিল না। তিনি আরও বলেন :

مَا ظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ بَقِيَ يَخْلُقُ مِثْلَكَ

'আমার মনে হয় না আল্লাহ ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো আর কোনো ব্যক্তিকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠাবেন।'[৯]

ব্যক্তিজীবনে ইবনু তাইমিয়াহ ছিলেন নিঃসঙ্গ। তাঁর স্ত্রী-সন্তান ছিল না। ছিল না কোনো জমি, বাড়ি, সম্পদ কিংবা প্রশাসনিক মর্যাদা। উমাইয়্যা মসজিদের পাশে এক রুমের ছোট্ট ভাড়া ঘরে থাকতেন। অধিকাংশ সময় মসজিদেই ঘুমাতেন। তাঁর কাছে ভালো খাওয়াদাওয়ার অর্থ ছিল বড় এক টুকরো রুটি। তাঁর পোশাক বলতে ছিল দুটো জোব্বা। এর মধ্যে একটি তিনি এক ভিক্ষুককে দান করে দেন। বাকিটা জীবন তিনি কাটিয়ে দেন মাত্র একটি জোব্বা দিয়েই। তবুও এত দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগেরও পরও, কারাগারের অন্ধকারে নির্যাতনের পরও তিনি বলতেন—আমার জান্নাত তো আমার হৃদয়ে। আমাকে যদি হত্যা করো, তাহলে আমি হব শহীদ। বন্দিত্ব আমার জন্য নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করার সুযোগ। আর নির্বাসন আমার জন্য ভ্রমণ, আল্লাহর সৃষ্টি দেখার সুযোগ।

সব মিলিয়ে তিনি সাতবার কারারুদ্ধ হন, আর কারাগারে মোট পাঁচ বছর কাটান এবং কারাগারেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই হলো ইবনু তাইমিয়্যাহ। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ।

*মানাকিব ইবনু তাইমিয়্যাহ*-তে আবু হাফস আল-বাযযার ﷺ বলেছেন, "শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর প্রতি তাঁর নিজ ভাইয়ের চেয়ে বেশি অনুগত আমি আর কাউকে দেখিনি।" তিনি যেখানেই যেতেন ভাইকে সাথে নিতেন এবং তাঁর পার্থিব বিষয়াদির দেখাশোনা তাঁর ভাইও করতেন। এ ছাড়া তাঁরা একসাথে জেলেও ছিলেন। তিনি সব সময় শাইখের কাছে এমনভাবে বসতেন, এমন গভীর মনোযোগ, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্থির হয়ে তাঁর কথা শুনতেন, যেন তার মাথায় কোনো পাখি বসে আছে। শ্রদ্ধার আধিক্যের কারণে দেখে মনে হতো তিনি শাইখকে ভয় পাচ্ছেন। যদিও এটা ছিল শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। এতে অন্য ছাত্ররা অবাক হতো।

সাধারণত একই পরিবারের লোকেরা পরস্পরের সান্নিধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাদের নিজেদের মধ্যেকার আচরণে অতটা সৌজন্যমূলক গাম্ভীর্য কাজ করে না, যেটা বাইরের লোকদের বেলায় হয়ে থাকে। আত্মীয়দের মাঝে, বিশেষ করে ভাইদের সম্পর্ক সহজ ও খোলামেলা হয়। অথচ ইবনু তাইমিয়্যাহর ভাইকে দেখে মনে হতো, শাইখের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছাত্রদেরও হার মানিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ইবনু তাইমিয়্যাহর ভাই বলতেন, "আমি তাঁকে যেভাবে চিনি অন্য কেউ তাঁকে সেভাবে

---

[৯] *আর-রাদ্দুল ওয়াফির* : ৪২

চেনে না। আর যদি না দেখি তা আমাকে তাঁর প্রতি এমন শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ প্রকাশে বাধ্য করে।"

তিনি ইবনু তাইমিয়্যাহর ইবাদত ও আল্লাহভীরুতা সম্পর্কে জানতেন, আর তাই শাইখকে অন্যান্য ছাত্রদের চেয়েও গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ ছিলেন একজন সত্যিকারের আলিম। ইবনু দাকিকুল ঈদ رحمه الله বলেন, "ইবনু তাইমিয়্যাহকে দেখার পর আমার মনে হলো, যেন ইলমের মহাসমুদ্র তাঁর চোখের সামনেই রয়েছে। তিনি তা থেকে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করেন এবং যেটা ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।"

সম্প্রতি আমি একজন শাইখের বক্তব্য শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, আমি স্টুডিওতে গিয়েছিলাম আমার অনুষ্ঠান রেকর্ড করার জন্য। প্রযোজক আমাকে বললেন, স্টুডিওতে আমাদের কাছে অমুক অমুক দা'ঈরাও আসেন। তারা আমাদের কাছে এসে বলেন, ক্যামেরাটা এমনভাবে রাখুন যাতে পর্দায় আমাদের নোটগুলো দেখা না যায়। দর্শক যেন বুঝতে না পারে যে আমরা নোট ব্যবহার করছি।

এখন ইন্টারনেট থেকে কোনো লেকচার নামিয়ে, প্রিন্ট করে, সাথে কিছু মালমশলা যোগ করে ইউটিউবে নিজের ভিডিও আপলোড করে দেওয়া কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু এটা সত্যিকারের ইলম না। হ্যাঁ, এটা এইদিক থেকে উপকারী হতে পারে যে, আপনি রাসূলুল্লাহর ﷺ ওই হাদিসের ওপর আমল করলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً - একটি আয়াত হলেও তোমরা পৌঁছে দাও। যদি আল্লাহ ﷻ ও রাসূলের ﷺ কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিয়্যাতে কেউ এমন করে, তবে সেটা অবশ্যই ভালো। কিন্তু কারও কিছু লেকচার থাকার মানে এই না যে সে একজন আলিম, একজন মুফতি। কারও কিছু লেকচার আর অনেক সমর্থক আর অনুসারী থাকার মানে এই না যে, সে একজন আলিম অথবা একজন তালিবুল ইলম বা একজন তালিবুল ইলমের ছাত্র। আজকে অল্প কিছু লেকচার দেওয়ার পরই বক্তারা এমন সব বিষয়ে কথা বলা শুরু করে, উম্মাহর ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন সব কথা বলে, সাহাবিগণও যেসব বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে দূরে থাকতেন। এগুলো ইলম নয়, প্রকৃত তালিবুল ইলম হলো ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো।

একজন তালিবুল ইলম হিসেবে বিবেচিত হবার জন্য তাওহিদ, ফিকহ, সিরাহ ও মৌলিক আকিদাহ-সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান রাখতে হয়। ইবনু দাকিকুল ঈদ বলেন, ইবনু তাইমিয়্যাহর এই সব বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল, তারপরও তাঁকে কারাগারে

মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। ইবনু তাইমিয়্যাহ এতটাই ব্যাপক ও সুবিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে আয-যাহাবি ﷺ বলেছেন,

এমনটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ইবনু তাইমিয়্যাহ যে হাদিস জানেন না, সেটা কোনো হাদিসই নয়।[৬০]

এ হলো ইমাম আয-যাহাবির কথা। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইলমুল হাদিসেও তিনি অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

আবুল বাকা আস-সুবকি ﷺ বলেছেন,

আল্লাহর কসম, মূর্খ ও নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসারীরা ছাড়া আর কেউ ইবনু তাইমিয়্যাহকে অপছন্দ করে না। মূর্খরা তাঁর কথা বুঝতে পারে না আর যারা নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে, সত্য জানার পরেও প্রবৃত্তি তাদের সত্য গ্রহণে বাধা দেয়।[৬১]

কারাগারে যাবার সময় তিনি ছিলেন আহমাদ ইবনু তাইমিয়্যাহ আর কারাগার তাঁকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহতে পরিণত করেছিল। বন্দী অবস্থায় ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছিলেন, আমরা অন্তরে কী সুখ অনুভব করি তা যদি রাজারা জানত তবে তারা তরবারির খোঁচায় আমাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিত।

কারও জান্নাত যখন তার হৃদয়েই থাকে, তখন কারাগার কিংবা অন্য কোনো পার্থিব ক্ষতি তাকে খুব সামান্যই স্পর্শ করে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেছেন,

إنَّ فِيْ الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَا يَدْخُلُ جَنَّةَ الآخِرَةِ

দুনিয়ার জীবনেও একটি জান্নাত আছে। যে এই জান্নাতে প্রবেশ করেনি, সে পরকালীন জান্নাতেও প্রবেশ করবে না।[৬২]

ইবনু তাইমিয়্যাহ কোন জান্নাতের কথা বলেছিলেন?

---

[৬০] যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ : ৩৩৯

[৬১] আশ-শাহাদাতুয যাকিয়্যাহ : ৪৮

[৬২] আল ওয়াবিলুস সাইয়িব মিনাল কালিমিত তাইয়িব : ১/৫৭

আল্লাহর ﷻ কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, একনিষ্ঠ ইবাদত, আল্লাহর ﷻ প্রতি বিনয়াবনত হওয়া, যখন অন্যরা বিমুখ থাকে এবং মুনাফিকরা পেছনে পড়ে থাকে এমন অবস্থায় আল্লাহর ﷻ দ্বীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে বান্দা দুনিয়াতেই জান্নাতের স্বাদ উপভোগ করে থাকে। একমাত্র আল্লাহর ﷻ একনিষ্ঠ বান্দারাই এই আনন্দ উপভোগ করে। তখন দুনিয়াকেই তাঁদের কাছে জান্নাত মনে হয়। তাই ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন, যে এই দুনিয়ার জান্নাতে প্রবেশ করেনি, সে পরকালীন জান্নাতেও প্রবেশ করবে না। ইবনু হাজার ﷬ *আর-রাদ্দুল ওয়াফির* গ্রন্থের তাকরিযে মন্তব্য করেছেন,

*"ইবনু তাইমিয়্যাহর জনপ্রিয়তা সূর্যের উজ্জ্বলতাকেও হার মানায়। নিজ সময়ে তিনি ছিলেন শাইখুল ইসলাম, আর আজও তিনি শাইখুল ইসলাম আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। অজ্ঞ ও ইনসাফহীন লোক ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।"*[৫৩]

এ উক্তির শত শত বছর পর আজ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইবনু হাজার সত্যই বলেছিলেন। আজও ইবনু তাইমিয়্যাহ শাইখুল ইসলাম। আর অজ্ঞ ও ইনসাফহীন লোক ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করবে না। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যার জীবন কেটেছে কারাগারে। আল হাফিজ আশ শাহির আলামুদ্দিন আল বারযালি ﷬ তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

একমাত্র আহমাদ ইবনু হাম্বল ছাড়া আর কারও জানাযায় ইবনু তাইমিয়্যাহর জানাযার মতো এত মানুষ দেখা যায়নি।

এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আহমাদ ইবনু হাম্বল বাগদাদে ছিলেন এবং সেখানকার জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।[৫৪]

কে ইবনু তাইমিয়্যাহকে চেনে না? তিনি ইসলামের হেফাযত করেছিলেন, তাই আল্লাহ ﷻ তাঁর নাম ও এর স্মরণকে হেফাযত করেছেন। তাঁর ইলম আজও বহমান। বিশ্বজুড়ে তালিবুল ইলমগণ এবং উম্মাহর সাধারণেরা প্রতিদিন কতবার তাঁর নাম উচ্চারণ করে এবং তারপর বলে, রহিমাহুল্লাহ—আল্লাহ ﷻ তাঁর ওপর রহম করুন। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য যেসব আলিম ছিলেন, যাদের আধিপত্য ছিল, যারা জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের নাম কিন্তু আজ খুব কমই স্মরণ করা

৫৩ *জাওয়াহিরুল মুদ্বিইয়াহ* : ৭২

৫৪ *জাওয়াহিরুল মুদ্বিইয়াহ* : ৭২

ইউসুফের ﵇ পাঠশালার আরেক বিখ্যাত শিক্ষার্থী হলেন ইমাম আবু হানিফা। মহান এই ইমামকে জীবনে অসংখ্য পরীক্ষার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল খারিজিদের ফিতনা। তবে তিনি অন্যান্য যেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেগুলোর তুলনায় এটা অতটা মারাত্মক ছিল না। খারিজিদের ফিতনা ছাড়াও উমাইয়্যাহ ও আব্বাসি খিলাফাহর পক্ষ থেকেও তিনি পরীক্ষায় পড়েছিলেন।

একবার দাহ্হাক ইবনু কাইস আশ-শাইবানি নামে এক খারিজি দলবল নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে বন্দী করে। আলি ﵁ ও মুয়াউইয়ার ﵁ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার ﵀ অবস্থানের কারণে এই খারিজি তাঁকে তাওবা করতে বলে। কিন্তু আবু হানিফা তাঁর নিজ মতের ওপর অটল থেকে বিতর্ক চালিয়ে যান। অবশেষে হার মেনে তারা তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আরেকবার খারিজিরা তাঁর কাছে এসে বলল, "হে আবু হানিফা, আমরা দুটো লাশ নিয়ে এসেছি। এদের একজন ছিল পতিতা এবং অন্যজন মারা গেছে অতিরিক্ত মদপানের কারণে"।

আদি খারিজিদের আকিদাহ ও মূলনীতি হলো, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির।[৩৫] কোনো মুসলিম যদি কবিরা গুনাহ করে, তাহলে সে কাফির। তারা চাচ্ছিল আবু হানিফা যেন ওই দুই মৃতকে সবার সামনে তাকফির[৩৬] করেন। আবু হানিফা তাদের সাথে তর্ক শুরু করলেন। কারণ, আমাদের অর্থাৎ আহ্লুস সুন্নাহর বিশ্বাস হলো সালাত আদায়কারী ব্যক্তি কবিরা গুনাহের ওপর মারা গেলে তাকে কাফির বলা যাবে

---

[৩৫] এটা হারুরিয়্যাহ খারিজিদের আকিদাহ। কিন্তু ইতিহাসে এমন খারিজি জামাআহও এসেছে যারা কবিরা গুনাহের কারণে তাকফির করে না। কবিরা গুনাহের ওপর তাকফির করা হারুরিয়্যাহ অর্থাৎ খারিজিদের প্রথম জামা'আহর বৈশিষ্ট্য হলেও, সাধারণভাবে খারিজিদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এমন কোনো কিছুর কারণে মুসলিমদের কাফির ঘোষণা করা, যার কারণে আহ্লুস সুন্নাহর মতে তাকফির করা যায় না। এটা কবিরা গুনাহ হতে পারে, সগিরাহ গুনাহ হতে পারে। কোনো ভালো আমলের জন্যও হতে পারে।

[৩৬] তাকফির : কাউকে কাফির ঘোষণা করা।

সূচিপত্র

না। তিনি তাদের একের পর এক যুক্তি দেখাতে থাকলেন, তর্ক করতে থাকলেন। এক সময় তারা তর্কে হার মানল এবং তাদের বেশির ভাগই খারিজি ফিরকা ছেড়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদাহতে ফিরে এল।

উমাইয়্যাহ শাসনামলে ইয়াযিদ ইবনু আমর ইবনু হুবাইরাহ নামে ইরাকের একজন গভর্নর ছিলেন। মুওয়াফাক তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, গভর্নর থাকাকালীন ইরাক শাসনের ব্যাপারে ইবনু হুবাইরাহ নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলেন। তাই তিনি ফকিহদের নিজের দরবারে একত্র করলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ইবনু আবি লায়লা, ইবনু শুবরামাহ এবং দাউদ ইবনু আবি হিন্দ। প্রত্যেকেই আবু হানিফার প্রায় সমমর্যাদাসম্পন্ন আলিম ছিলেন। ইয়াযিদ তাঁদের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করলেন। তাদের কাযী বানালেন। আলিমদের পেছনে তিনি উদারভাবে খরচ করতেন। বলা হয়ে থাকে, তার অধিকাংশ সম্পদ আলিমদের পেছনে ব্যয় হতো। এর কারণ হলো উম্মাহর সাধারণ মানুষেরা শাসকদের কথার ওপর ভরসা করে না। সাধারণ মানুষ আলিমদের বিশ্বাস করে, তাঁদের ওপর ভরসা করে। এ কারণে যুগে যুগে শাসকশ্রেণি আলিমদের ব্যবহার করে নিজেদের কাজের বৈধতা তৈরির চেষ্টা করে।

ইয়াযিদের ইচ্ছা ছিল আবু হানিফাকে প্রধান কাযী বানানো। তিনি তাঁকে একটি মোহরাঙ্কিত আংটি দিলো এবং বলল এতে আপনার নামে প্রশাসনিক সিল বসানো আছে। আবু হানিফা আংটি এবং পদ দুটোই গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। মনে রাখবেন, ইবনু হুবাইরাহ ছিলেন একজন মুসলিম শাসক। হতে পারে তার মাঝে কিছু দোষ ছিল, তিনি বিভিন্ন সময় জনগণের ওপর যুলুম করতেন, কিন্তু তারপরও তিনি ছিলেন একজন মুসলিম শাসক। আজকের তথাকথিত মুসলিম শাসকদের একজনেরও তার সাথে তুলনায় যাবার মতো যোগ্যতাটুকুও নেই। কিন্তু আবু হানিফা তার অধীনে চাকরি করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

ইবনু হুবাইরা বললেন, আপনি যদি এই পদ গ্রহণ না করেন, তবে আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে চাবুকপেটা করব। প্রাসাদে তাঁকে ঘিরে থাকা অন্যান্য আলিমগণ এ কথা শুনলেন। তাদের মাঝে কেউ কেউ আলিম হয়েছিলেন কেবল জীবিকা অর্জনের জন্য। কীভাবে বাসায় ফিরে নিশ্চিন্তে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, এই ছিল তাদের চিন্তা। আবার অনেকের ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন সভা-সেমিনার করে বেড়ানো আর তারপর বাড়ি ফিরে স্ত্রী-সন্তানের সাথে আরাম-আয়েশে জীবন কাটানো। তারা মোটা অঙ্কের টাকা উপার্জন করতে চাইতেন। ওয়াজ, সেমিনার, বক্তৃতা ও আলোচনাসভাগুলো থেকে অল্পসল্প কিছু বাড়তি উপার্জন করতে চাইতেন তাঁরা। আর কিছু এমন আলিম ছিলেন যারা সত্যিকার অর্থে হকপন্থী। যাদের সময় কাটত ইলমের সাধনা আর

উম্মাহকে শেখানোয়। উম্মাহর নানা সমস্যা তাঁদের ব্যথিত করত। উম্মাহর বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্ব পালনে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তাঁরাই হলেন হকপন্থী আলিম, আর আবু হানিফা ﷺ ছিলেন এমনই একজন।

অন্যান্য আলিমগণ আবু হানিফাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তাঁরা বললেন, আবু হানিফা প্রধান কাযীর পদ গ্রহণ করুন। আমির আপনাকে দোররা মারার কথা বলেছে, নিজেকে এভাবে ক্ষতির মধ্যে ফেলবেন না। নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন না, নিজেকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলবেন না যেখানে আপনি কারাগারে যেতে বাধ্য হবেন। সব আলিম তাকে বোঝানোর এবং পরিস্থিতি শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। আবু হানিফা বললেন, "আল্লাহর কসম! সে যদি আমাকে ওয়াসিলের মসজিদগুলোর দরজা গুনতে বলে, আমি তাও করব না। সে যদি আমাকে শুধু এটুকুও বলে, সেখানে যান, কয়টা দরজা আছে দেখুন আর আমাকে জানান—আমি তাও করব না। তোমরা কি চাইছ আমি অন্যায়ভাবে কারও মাথা উড়িয়ে দিই আর তা পদদলিত করি?"

তিনি শাসকদের কাছ থেকে পদ গ্রহণ করতে চাননি। মূলত সমস্যা পদ নিয়ে ছিল না। কাযীর পদ গ্রহণ করার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু আবু হানিফার ভয় ছিল শাসকদের প্রতি ভক্তি কিংবা ভয়ের কারণে হয়তো তিনি কারও ওপর অবিচার করে বসবেন আর এ জন্য তাঁকে আল্লাহর ﷻ দরবারে অভিযুক্ত হতে হবে। তিনি শাসকদের কাছ থেকে, শাসকের দরজা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন শাসকের অধীনে চাকরি গ্রহণ করার মাধ্যমে, শাসকদের দরজায় প্রবেশের মাধ্যমে তিনি ফিতনায় জড়িয়ে পড়বেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন হয়তো শাসকদের দ্বারা তিনি দ্বীনের ব্যাপারে প্রতারিত কিংবা বিভ্রান্ত হবেন। এই ছিল ইমাম আবু হানিফার অবস্থান। তাহলে বলুন বর্তমান শাসকশ্রেণির ব্যাপারে আলিমদের অবস্থান কী হওয়া উচিত?

আবু হানিফা বলেছিলেন, "আমি তোমার অধীনে মসজিদের দরজা গোনার কাজও করব না। সেখানে তোমরা আমাকে প্রধান কাযীর পদ গ্রহণ করতে বলছ?" অথচ অন্যান্য আলিমগণ সরকারি পদ গ্রহণ করলেন, তাদের মাঝে অনেক ভালো আলিমও ছিলেন। কিন্তু আবু হানিফা একে প্রত্যাখ্যান করলেন। আজ হিসেব করে দেখুন ইতিহাস কাকে মনে রেখেছে।

অথচ সেই সময়ে এই আলিমরাই ছিলেন জনসাধারণের কাছে পরিচিত নাম। মানুষ তাঁদের দিকেই তাকিয়ে থাকত। সে যুগে আজকের মতো ফেইসবুক বা টুইটার

থাকলে এই আলিমদের অসংখ্য অনুসারী থাকত। সেই সময়কার মিডিয়াতে তাঁদেরই প্রশংসা আর গুণকীর্তন করা হতো। তাঁদের পরিচিতি ছিল সব জায়গায়। যেকোনো মসজিদে গিয়ে তাঁরা বয়ান করতে পারতেন। তাঁরা ছিলেন জনগণের কাছে সুপরিচিত। অধিকাংশ সময়েই সাধারণ জনগণ হকপন্থী আলিম আর শাসকদের অনুগত আলিমদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। কারণ, শাসকরা এসব আলিমদের পেছনে প্রচুর খরচ করে তাঁদের নামের প্রচার-প্রসার ঘটায়, যাতে করে এসব আলিমদের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত করে জনগণের চোখে বৈধতা অর্জন করা যায়। যাতে করে নিজেদের সিদ্ধান্তের সাফাই গাওয়ার জন্য এসব আলিমকে কাজে লাগানো যায়।

কিন্তু আজ তাকিয়ে দেখুন, ইতিহাস কাকে মনে রেখেছে? আজ কতজন আবু হানিফার সময়কার কাযী আবু লায়লাকে চেনে? আজকে কে চেনে তাকে? ইবনু শুবরামাহ, দাউদ ইবনু আবি হিন্দ—আপনাদের একজনও কি তাঁদের চেনেন? কেউ কি শুনেছেন তাদের নাম? অথচ আবু হানিফার যুগে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় আলিম। আজ প্রায় কেউই তাঁদের চেনে না, কিন্তু আবু হানিফাকে চেনে না, এমন কে আছে?

আজ এমন অবস্থা হয়েছে, কেবল মুসলিম দেশগুলোতেই না, বরং পশ্চিমা বিশ্বেও শাসকদের হাতে এমন আলিমগণ আছে যারা তাদের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন এক দ্বীনের প্রচলন করছে। আজ দ্বীনের আধুনিকায়ন করা হচ্ছে, শুধু তথাকথিত মুসলিম শাসকদের ইচ্ছানুসারে নয়; বরং কুফফারদের ইচ্ছানুসারে ও তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্য নির্ধারিত ইলম দুনিয়াবি স্বার্থ অর্জনের জন্য যে শিক্ষা করে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।[৩৭]

'আরফাল জান্নাহ' মানে জান্নাতের সুঘ্রাণ। এক হাদিসে এসেছে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যাবে চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে। অপর দুই হাদিসের একটিতে সত্তর বছর

---

[৩৭] *আবু দাউদ*: ৩৬৬৬

ও আরেকটিতে এক শ বছরের দূরত্বের কথা বলা হয়েছে। তিনটি বর্ণনার সবগুলোই সহিহ, এগুলো ছাড়া এ বিষয়ে অন্যান্য বর্ণনাগুলো সহিহ না। যারা দুনিয়াবি উপার্জন বা স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে ইলম শিক্ষা করে তাদের জন্য এই হাদিস একটি মারাত্মক সতর্কবাণী।

এখন চিন্তা করুন, শুধু দুনিয়াবি স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইলম শিক্ষার পরিণতি যদি এত ভয়ানক হয়, তবে তাদের পরিণতি কী হবে যারা কুফরের নেতাদের সেবার জন্য অথবা পূর্ব ও পশ্চিমে কুফরের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইলম অর্জন করে? ইলম অর্জনের নিয়্যাত যদি অশুদ্ধ হয়, যদি আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ইলম অর্জন করা হয়, তবে সেটা কবীরা গুনাহ। শুধু ভুল নিয়্যাত রাখা যদি কবীরা গুনাহ হয়, তাহলে অর্জিত ইলম দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার পরিণাম কতটা মারাত্মক হতে পারে কল্পনা করুন।

আবু হানিফার সময়কার জনপ্রিয় ও পদমর্যাদাসম্পন্ন আলিমদের আজ কেউ চেনে না বললেই চলে। যদিও তাঁদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট কিংবা মুনাফিক ছিলেন না। অনেকেই শুধু দুর্ভোগ কিংবা শাসকদের তীক্ষ্ণ নজরদারি এড়াতে সরকারি পদ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মাঝে খুব অল্পসংখ্যকই মুনাফিক ছিলেন। তবুও তাদের আজ কেউই চেনে না, কিন্তু এমন কে আছে যে আবু হানিফাকে চেনে না? তাঁদের আমলের কারণে আল্লাহ ﷻ তাঁদের ইলমের বারাকাহ উঠিয়ে নিয়েছেন। তারা হয়তো সাময়িকভাবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, হয়তো কেউ কেউ একে বারাকাহও মনে করেছিলেন, কিন্তু সময়ের আবর্তনে তা ম্লান হয়ে হারিয়ে গেছে। অথচ ইমাম আবু হানিফা رحمه الله ও তাঁর ইলমের প্রতি তাকান। তাঁর ফাতওয়া, তাঁর মাযহাব আজও বিদ্যমান, আজও উজ্জ্বল।

সরকারি পদ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে ইমাম আবু হানিফার ওপর নির্যাতন শুরু হয়। যাকে চাবুক মারার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ইবনু হুবাইরার কাছে গিয়ে সে বলল আবু হানিফার অবস্থা মৃতপ্রায়। ইবনু হুবাইরা বলল, তাঁকে গিয়ে বলো যেন তিনি আমার প্রস্তাব মেনে নেন, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। হয় তিনি পদ গ্রহণ করুন, নতুবা চাবুক মারা অব্যাহত থাকবে।

আবু হানিফা বললেন, "তুমি ফিরে যাও এবং তাকে বলো, আল্লাহর কসম, সে যদি আমাকে ওয়াসিলের কোনো মসজিদের দরজা গুনতে বলে, আমি সেটাও করব না।" বন্দী অবস্থায় তাঁকে চাবুক মারা হচ্ছিল, এমন অবস্থায় তিনি এ কথা বলেছিলেন।

ইচ্ছে করলেই নির্যাতনের বদলে পার্থিব সুখ বেছে নিতে পারতেন, এমন অবস্থায় তিনি এ কথা বলেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত চাবুক মারার দায়িত্বে নিযুক্ত লোকটির মনে দয়া হলো। একবার ভাবুন, শাসক কিংবা আলিমদের মনে না; বরং যে লোকটি চাবুক মারছিল তার অন্তরে আবু হানিফার প্রতি দয়ার উদ্রেক হলো। সালিশের পর আবু হানিফাকে বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো। তবে শর্ত দেওয়া হলো, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে এই আশায় মুক্তি দিলো যে, তিনি হয়তো একে উদার আচরণ মনে করবেন এবং নিজের মত পরিবর্তন করবেন। ঠিক এ সময়টাতেই ইবনু হুবাইরা স্বপ্নে দেখল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাকে বলছেন, তুমি এমন একজন মানুষকে দোররা মারছ যে কিনা নিরপরাধ?

সুতরাং সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা আর ইবনু হুবাইরার স্বপ্ন, এই দুই কারণে তারা আবু হানিফাকে সাময়িকভাবে মুক্তি দিলো। আশা ও আশঙ্কা নিয়ে তাঁর মত পরিবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল। মুক্তি পাবার পর আবু হানিফা তাঁর উট নিয়ে মক্কার উদ্দেশে পালিয়ে গেলেন। উমাইয়্যাহ শাসন পরিবর্তিত হয়ে আব্বাসি শাসন শুরু হওয়া পর্যন্ত তিনি মক্কাতেই ছিলেন।

কল্পনা করুন, আজ কেউ যদি কোনো শাসককে বলে যে আমি অমুক পদ গ্রহণ করব না, তবে তাঁকে কী বলা হবে? বাতিল মুরজিয়ারা[৩৮] তাঁর ব্যাপারে কী প্রচার করবে? তারা নিশ্চিত তাঁকে খারিজি আখ্যায়িত করবে। আবু হানিফা যে শাসকদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তারা বর্তমান যেকোনো শাসকের চেয়ে উত্তম। এ শাসকেরা কখনোই আজকের শাসকদের মতো নিজেদের সম্মান বিকিয়ে দেয়নি, ইসলামের শত্রুদের সাথে জোটবদ্ধ হয়নি, কখনো উম্মাহর শত্রুদের পদক দিয়ে সম্মানিত করেনি। উম্মাহর সম্পদ কুফফারের কাছে বিকিয়ে দেয়নি। তবুও আবু হানিফা তাদের দেওয়া পদমর্যাদা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ইবনু হুবাইরা নামে যে শাসক আবু হানিফার সাথে অন্যায় আচরণ করেছিলেন, তার শাসনামলে আজকের মতো বাগদাদে কাফিররা ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াত না। ইবনু হুবাইরাহ বাগদাদকে মুসলিমদের চেয়েও কাফিরদের জন্য অধিক উপভোগ্য করে তোলেনি। ইবনু হুবাইরা এবং তার মতো অন্যান্য শাসকদের মধ্যে কিছু যুলুম, অত্যাচার থাকলেও তারা ছিল মুসলিম শাসক।

---

[৩৮] একটি বাতিল ফিরকা। 'মুরজিয়া' শব্দটি এসেছে 'ইরজা' থেকে—যার অর্থ হলো বিলম্বিত করা। মূলত মুরজিয়াদেরকে মুরজিয়া বলা হয় এ জন্য যে, তারা আমলকে ঈমান থেকে বিলম্ব বা বিচ্ছিন্ন করে।

আর আজ বাতিল মুরজিয়ারা আপনাকে বলবে, শিয়া নেতা মালিকী হলো ইরাকের উলুল আমর।[৩১] সুতরাং তার আনুগত্য করা ফরয, আর যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, সে খারিজি।

আবু হানিফার শাস্তি ছিল কারাদণ্ড আর দশ দিন প্রতিদিন দশটি করে দোররা। কারও কারও মতে, এগারো দিন। সুতরাং সব মিলিয়ে ১১০ দোররা। আলিমগণ বলেন যে, দোররা মারার সময় তিনি অত্যন্ত সবর ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্যতিক্রম ছিল যখন তাঁর মুখে আঘাত করা হতো। কারণ, তাঁর মা এ শাস্তির ব্যাপারে জানবেন, এটা তিনি চাইতেন না। তিনি চাইতেন না মুক্তির পর অথবা ভবিষ্যতে তাঁর মা এ আঘাতের চিহ্ন দেখুন। তবে শেষ পর্যন্ত আবু হানিফার মুক্তির পর তাঁর মা এ শাস্তির কথা জানতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তিনি আবু হানিফাকে বলেছিলেন, "বেটা! যে ইলম তোমার এ অবস্থা করেছে, তোমার উচিত তা পরিত্যাগ করা।" কষ্ট থেকে তিনি এ কথা বলেছিলেন। ইমাম আবু হানিফার জবাব ছিল বিস্ময়কর। তিনি বলেছিলেন, "মা আমি যদি দুনিয়া কামাই করতে চাইতাম তবে নিঃসন্দেহে আমি তা বহুগুণে পেতাম। কিন্তু আমি চাই আল্লাহ আমাকে তাঁর দ্বীনের ও তাঁর ইলমের রক্ষক হিসেবে জানবেন। তাই আমি চাইনি এসব দুনিয়াবি ব্যাপার আমাকে ধ্বংস করে ফেলুক।"

অর্থাৎ তিনি বলছেন, মা! শারীরিক কষ্ট আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু আমি যদি ইলমের অপপ্রয়োগ করি তবে সেটাই আমার জন্য ধ্বংস। দশ দিন নাকি দশ বছর—এতে কীই-বা যায় আসে? আমি তো আল্লাহর জন্য এ অবস্থান নিয়েছি আর তাঁরই জন্য একে আঁকড়ে ধরেছি।

কেন আবু হানিফার জন্য দৈনিক দশটি দোররা নির্ধারিত করা হলো? কেন একদিনে তারা পুরো শাস্তি প্রয়োগ করল না? কারণ, তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে কষ্ট দেওয়া, তাঁকে মেরে ফেলা না। তাঁর শরীর দশটির বেশি আঘাত সহ্য করতে পারত না, তাই তাঁকে দৈনিক দশটি করে দোররা মারা হতো। তাঁকে আরও বেশি যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য, তাঁর কষ্টকে দীর্ঘায়িত করার জন্য। কিন্তু এতকিছুর পরও আবু হানিফা তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন। তিনি প্রধান কাযীর পদ গ্রহণ করবেন না।

সুবহান আল্লাহ! এতকিছুর কারণ হলো তিনি সেই সময়কার সবচেয়ে সম্মানিত পদ—প্রধান কাযীর পদ গ্রহণ করতে রাজি না।

---

[৩১] মুসলিমদের নেতা, খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মুমিনিন।

তাঁর মুক্তির পর তিনি বলেছিলেন,

'নির্যাতনের চেয়েও আমার জন্য বেশি কষ্টদায়ক হলো আমার মায়ের দুঃখ।'[৮০]

তাঁর সন্তান কারারুদ্ধ আর তিনি নানা দুর্ভোগের সম্মুখীন, বিপর্যস্ত—শারীরিক নির্যাতনের চেয়েও এই যন্ত্রণা আমাকে বেশি ভুগিয়েছে।

ইমাম আবু হানিফার رحمه الله এ কথাগুলো অত্যন্ত সত্য। কারাগারে বন্দী অবস্থায় কেউ যদি তার মায়ের দুঃখ-দুর্দশা ও ভোগান্তির কথা শোনে, সে যদি সত্যিকারের মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর কাছে আর কোনো কষ্ট এর চেয়ে তীব্র মনে হবে না।

আমি আর আর বাবা বন্দী হবার সময় আমার মাকে শপথ করিয়েছিলাম, কোনো অবস্থাতেই যেন তিনি আমাদের বাসা ছেড়ে বের না হন। বরং তিনি বাসাতেই থেকে ইস্তিগফার করবেন, আমাদের জন্য দু'আ করতে থাকবেন কিংবা এই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবেন। আমার মা কথা রেখেছিলেন, রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। আল্লাহ ﷻ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মর্যাদা দান করুন। পরিবারের অন্যান্যদের কাছে আমি শুনেছি, তিনি প্রতিরাতে ঘুম থেকে উঠে যেতেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন আর দু'আ করতেন। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই—ইন শা আল্লাহ আমি নিশ্চিত যে, আল্লাহ ﷻ তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন এবং এ দু'আর কারণেই আমি মুক্তি পেয়েছিলাম।

ইমাম আবু হানিফার এ ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল, জেল থেকে একবার আমি বাসায় ফোন করেছিলাম। এর আগে বেশ অনেকদিন আমি কোনো ধরনের যোগাযোগ করতে পারিনি। ফোনে কথা বলার জন্য বরাদ্দ ছিল সাত কিংবা দশ মিনিট। জেল থেকে ফোন করা হলে, যার নম্বরে ফোন করা হচ্ছে, কলটি গ্রহণ করার জন্য তাকে একটি নির্দিষ্ট নম্বর চাপতে হয়। আমার মা এই নম্বরটি জানতেন। আমি ফোন ধরে আসসালামু আলাইকুম বলার আগেই তিনি সেই নম্বরটি প্রেস করে দিলেন। আল্লাহর শপথ, সাত বা দশ মিনিট ধরে আমি কেবল "আহমাদ, আহমাদ, হাবিবি আহমাদ, আহমাদ, আহমাদ" শুনতে পেলাম। এভাবে পুরো সময়টা কেটে গেল, রাহমাতুল্লাহি আলাইহা। বাসার কী অবস্থা, সবাই কেমন আছে—আমি কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ পেলাম না। আমার গলা শুনে মা এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মুখ থেকে কেবল আহমাদ ছাড়া আর কিছুই বের হচ্ছিল

৮০ তারিখু বাগদাদ : ৭/৩৭৭

না। আর এ অবস্থাতেই তিনি সারা বাড়ি ছুটোছুটি করছিলেন আর সবাইকে বলছিলেন—আহমাদ! আহমাদ ফোন করেছে।

এ জন্যই কারারুদ্ধ ব্যক্তি হয়তো যুলুমকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট না। কারণ, এখানে অন্যদের হকও জড়িত থাকে। একজন মানুষকে যখন বন্দী করা হয়, তখন ব্যাপারটা শুধু ওই একজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যুলুম শুধু একজনের ওপর হয় না। তাঁর মা, স্ত্রী, সন্তান—সবাই নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেন। হতে পারে কারারুদ্ধ ব্যক্তি নিজে ক্ষমা করে দিলেও, তাঁর আপনজনেরা যালিমের বিরুদ্ধে বিনিদ্র রজনী দু'আয় কাটিয়ে দেয়।

আবু হানিফাকে দোররা মারা হয়েছিল, কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, আর এই হলো হকপন্থীদের পথ।

আলি ইবনু আসিম رحمه الله বলেছেন,

لَوْ وُزِنَ عِلْمُ أَبِي حَنِيفَةَ بِعِلْمِ أَهْلِ زَمَانِهِ لَرَجَحَ

তোমরা যদি আবু হানিফার ইলমের সাথে তৎকালীন সমস্ত লোকের ইলমের তুলনা করো, তাহলে আবু হানিফার ইলমের পাল্লাই বেশি ভারী হবে।[৩১]

মনে রাখবেন, ইমাম আবু হানিফার رحمه الله সমকালীনদের মধ্যে অনেক বড় বড় আলিম ছিলেন, যার মধ্যে একজন হলেন ইমাম মালিক رحمه الله।

ইবনুল মুবারাককে رحمه الله প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কার ইলম বেশি? ইমাম মালিক নাকি অন্য কারও?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন,

أَبُو حَنِيفَةَ أَفْقَهُ النَّاسِ

লোকেদের মধ্যে আবু হানিফাই সর্বাধিক ইলম রাখেন।[৩২]

আবু মুয়াউইয়া আদ-দ্বারির رحمه الله বলেছেন,

حُبُّ أَبِي حَنِيفَةَ مِنَ السُّنَّةِ

আবু হানিফাকে ভালোবাসা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।[৩৩]

---

[৩১] *মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা*: ১/৩২

[৩২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৬/৪০৩

[৩৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ৬/৪০১

আমরা এমন একজন মানুষের কথা বলছি, যিনি বারবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এমন একজন ব্যক্তি, যিনি অবিচল দৃঢ়তায় উমাইয়্যাহ ও আব্বাসিদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ইমাম আয-যাহাবি বলেছেন, ফিকহশাস্ত্র ও এর শাখা-প্রশাখার নেতৃত্ব হলো আবু হানিফার। অর্থাৎ এ বিষয়ের ইমাম হলেন আবু হানিফা।

ইমাম আবু হানিফার ﵀ ওপর চালানো নির্যাতনের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে, এর কথা স্মরণ হলেই ইমাম আহমাদ ﵀ কেঁদে ফেলতেন। তাঁর চোখ থেকে পানি পড়ত, আর তিনি আবু হানিফার জন্য দু'আ করতেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো। যদি ফিকহ সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকে, তাহলে দেখবেন চার মাযহাবের মধ্যে দুটি মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য সবচেয়ে বেশি। মাযহাবের ইমামদের মধ্যে সময়ের দিক থেকে প্রথম হলেন ইমাম আবু হানিফা, আর শেষ হলেন ইমাম আহমাদ। আর তাঁদের মাযহাবের দুটির মধ্যেই পারস্পরিক মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি। এর কারণ হলো ইমাম আবু হানিফার সময়ে হাদিস সংকলন ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম, যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে ইজতিহাদ করতে হয়েছে। অন্যদিকে ইমাম আহমাদের সময় আসতে আসতে প্রচুর হাদিস সংকলন ও সেগুলোর তাহকিক করা সম্ভব হয়েছিল, যে কারণে ফিকহি মতের ক্ষেত্রে তিনি হাদিসের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে ইমাম আহমাদ কি কখনো এমন বলেছেন যে, আবু হানিফা কারাগারে নির্যাতন ভোগ করায় আমি আনন্দিত, কেননা তাঁর সাথে আমার অমুক অমুক বিষয়ে দ্বিমত ছিল। না, বরং তিনি তাঁর ভাই আবু হানিফাকে দোররা মারার কথা মনে করে কাঁদতেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করতেন। অথচ ইমাম আবু হানিফার সাথে ইমাম আহমাদের অসংখ্য ফিকহি মাসয়ালাতে মতবিরোধ ছিল। পরবর্তীকালে যখন ইমাম আহমাদকে দোররা মারা হচ্ছিল, তিনি আবু হানিফার কথা স্মরণ করেছিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন।

উমাইয়্যাহ শাসন পতনের আগ পর্যন্ত আবু হানিফা পলাতক ছিলেন। উমাইয়্যাহদের পতনের পর শাসন ক্ষমতায় এল আব্বাসিরা। আবু জাফর আল-মানসুর শাসকের পদ গ্রহণ করলেন। আবু জাফর ছিলেন একজন বিখ্যাত ও মহান নেতা। তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি জীর্ণশীর্ণ পোশাক পরিধান করতেন, তার সবগুলো পোশাক ছিল তালি দেওয়া। ২০ বিলিয়ন ডলারের কোনো বিলাসবহুল ইয়াট তার ছিল না। তার প্রাসাদ কিংবা ঘর কোথাও কোনো গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ছিল না। তিনি এসব নিষিদ্ধ করেছিলেন। যখন তিনি শুনলেন তার ভবনের আশেপাশে ভৃত্যরা ড্রাম বাজিয়েছে, তৎক্ষণাৎ তা ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অন্যদের মতো

ভোগবিলাস কিংবা কবিদের পেছনে অহেতুক খরচ করতেন না। তিনি তাদের একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের সম্মানি দিতেন। এসব কিছু সত্ত্বেও তার মধ্যে যুলুম ছিল, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে তার মধ্যে কিছু যুলুম থাকার পরও বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর সব শাসকদের একসাথে জড়ো করা হলেও, তারা আবু জাফরের পায়ের তলার সমান হতে পারবে না।

তার শাসনামলে মাজুসিরা[৬৬] নিশাপুর, কাওমাস এবং আর-রায় এ হামলা চালায়। এ জায়গাগুলো হলো বর্তমান ইরানের উত্তর দিকে। মাজুসিরা হামলা করে কিছু মুসলিমের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, কিছু মুসলিম পুরুষকে হত্যা করে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী করে নিয়ে যায়। ইতিহাস সাক্ষী, এ ঘটনার পর আবু জাফর আল-মানসুর মাজুসিদের দমন করার জন্য তার জেনারেল আল-ইজলিকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন, মুসলিমদের সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং প্রত্যেক মুসলিম নারী ও শিশুদের মুক্ত না করে ফিরবে না। আর ঠিক তা-ই হয়েছিল।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য আবু জাফর নিজের অধীনস্থ জনগণ, নিজ শহরের লোকদের ওপর যুলুম করত। কিন্তু যখনই বহিরাগত মাজুসিরা এসে ইরানের উত্তর প্রান্তে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছিল, তিনি সাথে সাথে তাদের নির্মূল করেছিলেন। এর সাথে কি বর্তমান শাসকদের তুলনা হয়, যারা মুসলিম নারীদের বন্দী করে আল্লাহর শত্রুদের হাতে তুলে দেয়?

আপনারা কি বুঝতে পারছেন কেন আমি বলছি, বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর সব শাসক একসাথে জড়ো করা হলেও তারা আবু জাফরের পায়ের তলার সমান হতে পারবে না?

আল-বাবাবি ﵀ বলেছেন, আবু জাফর আল-মানসুর লোকেদের কাছ থেকে এই মর্মে শপথ নিয়েছিল যে, যদি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, তাহলে তোমাদের রক্ত হালাল হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমরা বিদ্রোহ করলে আমি তোমাদের হত্যা করব। ইরাকের মসুলের অধিবাসীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আবু জাফর তাদের পরাজিত করল। সবাইকে একসাথে জড়ো করে কারাগারে নিক্ষেপ করল। আবু হানিফাসহ সব আলিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবু জাফর আলিমদের উদ্দেশ্য

[৬৬] পারসির অগ্নিপূজক, জরথুস্ত্রীয় ধর্মের অনুসারী।

করে বললেন, মুমিনমাত্রই নিয়ম মেনে চলে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনরা তাদের শর্তের ওপর অটল থাকে।[৫৪]

আমি বলেছিলাম, যদি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, তাহলে তোমাদের রক্তের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। দরবারি চাটুকার আলিমগণ বলে উঠল, হ্যাঁ, আপনি যথার্থই বলেছেন। আপনি তাদের কাছ থেকে শপথ নিয়েছিলেন এবং তারা শপথ ভঙ্গ করেছে। কাজেই, আপনি তাদের সবাইকে হত্যা করতে পারেন।

আবু হানিফা চুপ থাকলেন। 'এ ব্যাপারে আপনার কী বলার আছে আবু হানিফা?' আবু জাফর প্রশ্ন করলেন। আবু হানিফা বললেন, তারা এমন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, যে বিষয়ের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যেখানে এমন প্রতিশ্রুতি করাই অবৈধ, সেখানে আপনি তাদের ওপর বিধান কার্যকর করতে চাইছেন? না, আপনি এটা করতে পারেন না। ৩টি কারণ ছাড়া কোনো মুসলিমের রক্ত হালাল হয় না, তাদের মধ্যে একটি কারণও নেই। সুতরাং আল্লাহর আইন আপনার শপথ ও আপনাদের প্রবর্তিত আইনকে বাতিল সাব্যস্ত করছে। আবু হানিফা রাসুলুল্লাহর ﷺ ওই হাদিসের কথা বলছেন, যেখানে বলা হয়েছে যিনা, ইসলাম ত্যাগ অথবা অপর মুসলিমকে হত্যা—এই তিনটি ছাড়া অন্য কোনো কারণে মুসলিমের রক্ত ঝরানো বৈধ না। আবু হানিফা তাকে বললেন, এটা একটি ইসলামি খিলাফাহ। ইসলাম মুসলিমদের রক্তকে পবিত্রতা দান করে। সুতরাং তাদের হত্যা করা আপনার জন্য বৈধ নয়।

আবু জাফর ইমাম আবু হানিফার কথাকে মেনে নিলেন এবং বিদ্রোহীদের মুক্ত করে দিলেন। তিনি অনেক লোককে আটক করেছিলেন, কিন্তু তাদের সবাইকে ছেড়ে দিলেন। আর আবু হানিফাকে বললেন, আমি তাদের ছেড়ে দিলাম কিন্তু জনগণকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন না। এ কথা বলার পর তিনি আবু হানিফাকেও যেতে দিলেন।

যদিও শাসক তোষামোদ করছিল, তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করছিল তবুও আবু হানিফা হকের ওপর আগের মতোই দৃঢ়, অবিচল ও আপসহীন থাকলেন। এসব বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলা চালিয়ে গেলেন। অন্যান্যরা শাসককে খুশি করার চেষ্টা করত, আর শাসক চেষ্টা করত আবু হানিফাকে খুশি রাখার। আবু হানিফার ছাত্র জাফর বলেছেন, আবু হানিফা কথা বলা অব্যাহত রাখলেন এবং তার কণ্ঠ বাকি সবাইকে ছাপিয়ে যেতে থাকল। উম্মাহর যাবতীয় সমস্যায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন

[৫৪] *ফাতহুল বারি*: ২৫/৩১৭

করতেন। এক সময় আমরা তাঁকে বলতে বাধ্য হলাম—আবু হানিফা আপনি কখন শান্ত হবেন? আপনি যদি না থামেন, তবে তারা তো আমাদের গলায় ফাঁস ঝুলিয়ে দেবে।

উমাইয়্যাহদের সময়ে যা হয়েছিল আবু জাফরের শাসনামলেও হুবহু একই সমস্যা দেখা দিলো। বিদ্রোহ দমন করার পর তিনি আবু হানিফাকে ডেকে পাঠালেন। ইবনু হুবাইরার মতো তিনিও বললেন, আবু হানিফা আপনার কাযীর পদ গ্রহণ করা উচিত। আপনি প্রধান কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি মন্ত্রী আবদুল্লাহ ইবনু হুমাইদকে দিয়ে আবু হানিফার কাছে ১০,০০০ দিরহাম ও একজন দাসী পাঠালেন। আবু হানিফা বললেন, এগুলো ফেরত নিয়ে যান। আমি এগুলো গ্রহণ করব না। আবদুল্লাহ ইবন হুমাইদ বলল, এগুলো নিন। আবু হানিফা বললেন, আমি এগুলো প্রত্যাখ্যান করলাম।

সুতরাং আবু হানিফাকে আবারও দরবারে তলব করা হলো।

দরবার পৌঁছাবার পর আবু জাফর আল-মানসুর তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কাযীর পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি, আমি এ পদের উপযুক্ত নই। দীর্ঘক্ষণ তাদের মধ্যে বাদানুবাদ চলল। আবু জাফর উন্মাদ হয়ে গেলেন, কেননা আবু হানিফা তার মুখের ওপর কথা বলছিলেন। আবু হানিফা বললেন, আমি এ পদের উপযুক্ত নই। আবু জাফর বললেন, আপনি একজন মিথ্যাবাদী। আবু হানিফা বলেন, বেশ, এখন আপনি যেহেতু আমাকে মিথ্যাবাদী বলছেন, সুতরাং একজন মিথ্যাবাদী কী করে কাযীর পদে আসীন হতে পারে? আবু জাফর এতে আরও বেশি রেগে গেল এবং বলল, আল্লাহর কসম আপনি যদি কাযীর পদ গ্রহণ না করেন, তাহলে আমি আপনাকে দোররা মারব। ইবনু হুবাইরা যা বলেছিল, আবু জাফর ঠিক একই কথা বলল। আবু হানিফা বললেন, ওয়াল্লাহি! আমি কাযীর পদ গ্রহণ করব না।

রক্ষীদের একজন বলে উঠল, আমাদের আমির শপথ করেছেন আর পাল্টাপাল্টি আপনিও শপথ করলেন? আবু হানিফা বললেন, তিনি তো আমার চেয়ে ধনী, কাজেই সহজেই কাফফারা আদায় করতে পারবেন। আমি পারব না। আবু জাফর চাইলেই দশ জন গরিব মানুষকে খাইয়ে শপথের কাফফারা আদায় করতে পারবে। আমি গরিব মানুষ, আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না। আসলে তিনি তাদের নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন।

এই বাদানুবাদের পর আবু হানিফাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ জারি করা হলো। লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করল, আবু হানিফাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে, কারণ তিনি একজন খারিজি। এই হলো সত্যপন্থীদের পথ—তাঁদের দিন কাটে কারাগারে, আত্মগোপনে অথবা নির্যাতনে। যখন অন্যরা সময় কাটায় ফাইভ স্টার কিংবা সেভেন স্টার হোটেলে। আবু হানিফাকে খারিজি হবার অভিযোগে কারাগারে পাঠানো হলো। তারা আবু হানিফাকে শুধু খারিজি আখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হলো না; বরং তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়ের করা অভিযোগে বলা হলো যে, তিনি একজন আলাউই খারিজি। আপনারা সিরিয়ার হাফিয এবং তার ছেলে বাশার আল আসাদের নাম শুনেছেন। এরা হলো আলাউইদের বংশধর। বাশারের পূর্বপুরুষরা আবু জাফর আল-মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টায় সব সময় তৎপর ছিল। সুতরাং আবু হানিফাকে আলাউই আখ্যা দিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হলো।

আমি আপনাদের যা বলতে চাইছি তা হলো, বাতিলপন্থী মুরজিয়ারা যখন আজ আপনাকে খারিজি বলবে তখন উত্তেজিত হবেন না। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। আজকে কেবল বাতিল মুরজিয়ারাই যাকে তাকে খারিজি বলে বেড়ায় না। কিছুদিন আগে আমি এক পশ্চিমা মর্ডানিস্টকেও দেখলাম তার বক্তব্যে আমাদের সময়কার সবচেয়ে মহান মুসলিম নেতাদের একজনের ব্যাপারে খারিজি শব্দটি ব্যবহার করছে। আজ মুরজিয়াদের পাশাপাশি, মর্ডানিস্ট আর তথাকথিত সালাফিরাও ইচ্ছেমতো সবাইকে খারিজি আখ্যা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আবু জাফর তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করল ও তাঁর ওপর অত্যাচার চালানোর নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন, আবু হানিফার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করো। সর্বাত্মকভাবে তাঁর ওপর চাপ প্রয়োগ করো। তাঁকে মৃত্যুর ভয় দেখাও।

এ সময় আবু হানিফার বয়স ছিল সত্তরের কাছাকাছি। তিনি ছিলেন বয়সের ভারে দুর্বল। তারা ভয় পাচ্ছিল হয়তো তিনি কারাগারেই মারা যাবেন, আর এর ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। তাই তারা তাঁকে বাড়িতে ফেরার অনুমতি দিলো, কিন্তু তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখল। তিনি কারও সাথে কথা বলতে পারতেন না, সালাতের সময়ও ঘরের বাইরে যেতে পারতেন না, তাঁকে কোনো ফাতওয়া দিতে দেওয়া হতো না। তবুও তিনি তাঁর অবস্থানে অবিচল থাকলেন এবং গৃহবন্দী অবস্থাতেই ১৫০ হিজরিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বলা হয়ে থাকে, আবু জাফর আল-মানসুর গোপনে তাঁর ওপর বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি আবু হানিফার

কাছে বিষ মেশানো খাবারসহ এক লোককে পাঠিয়েছিল, যে তাঁকে সেই বিষ মেশানো খাবার খেতে বাধ্য করেছিল।

মৃত্যুর আগে আবু হানিফা ﷺ বলেছিলেন, আমাকে এমন কোনো মাটিতে কবর দিয়ো না, যা অন্যায়ভাবে অথবা তলোয়ারের জোরে শাসকরা কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

হকপন্থী আলিমগণ সব সময় শাসকদের সাথে লড়াই করে এসেছেন। যদিও বর্তমান শাসকদের সাথে তৎকালীন শাসকদের কোনো তুলনাই হয় না, তবুও হকপন্থী আলিমগণ কখনোই শাসকদের অন্ধ অনুসারী ছিলেন না। তাদের অনুগত কিংবা অধীনস্থ ছিলেন না। আমি আবারও বলছি, অতীতের এই শাসকদের মধ্য কিছু যুলুম-অত্যাচার ছিল, কিন্তু কোনোভাবেই এখনকার এসব শাসকদের সাথে তাদের তুলনা করা সম্ভব না।

আবু হানিফার এসব পরীক্ষার মধ্যে যে ব্যাপারটা আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করে তা হলো, তাঁর কারামুক্তির চাবি ছিল তাঁরই হাতে। তিনি চাইলেই কারাগার থেকে বের হতে পারতেন। কী ছিল কারামুক্তির সেই চাবি? কী করলে তিনি স্বাধীন জীবনে ফিরে যেতে পারতেন? দুক্ষেত্রেই তাঁকে কেবল একটি কাজই করতে হতো, আর তা হলো—তাঁর সময়ের সবচেয়ে সম্মানজনক ও সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ করা, যা ছিল সেই সময়ের প্রত্যেক আলিমের স্বপ্ন। কিন্তু তিনি বললেন,

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ

'হে আমার রব, কারাগারই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।'[illegible]

কোন জিনিসটির চেয়ে চাবুকের আঘাত, কারাগারের নির্যাতন, বন্দিত্ব ও অপমানের জীবন আবু হানিফার কাছে বেশি প্রিয় ছিল? তাঁকে কী করতে বলা হয়েছিল? কোন জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি এগুলো বেছে নিয়েছিলেন? তাঁর সময়ের যেকোনো আলিম কিংবা ইমামের জন্য প্রধান কাযীর পদ পাওয়া ছিল স্বপ্নের মতো। কিন্তু একবার না, বরং দুবার তিনি এই পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রথমবার উমাইয়াহ খিলাফাহর সময় ও পরেরবার আব্বাসি খিলাফাহর যুগে। আপনারা কি এখন উলামা

---

[illegible] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩

রব্বানিয়্যুন[৬৭] এর সাথে উলামা আদদুনিয়া ও উলামা আস্‌সালাতিনের[৬৮] পার্থক্য বুঝতে পারছেন?

আবু হানিফা কোন ধরনের শাসকদের অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন? তিনি কাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? আবু জাফর আল-মানসুর এবং ইয়াযিদ ইবনু হুবাইরা। ইবনু হুবাইরার ভুল ছিল, সে যুলুম করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি হৃদয়ে কাঠিন্য অনুভূত হওয়ামাত্রই আলিমদের ডেকে পাঠাতেন। তিনি আলিমদের তার বাসভবনে ডাকতেন ও তাঁদের বলত, আমাকে নাসীহাহ করুন। হাসান আল-বাসরি ﵀ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাকে নাসীহাহ করতেন, যার ফলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। ইমাম শাবি ﵀ বলেছেন, আমি এবং হাসান আল-বাসরি ইবনু হুবাইরার ওখানে যেতাম। হাসান আল-বাসরি তাকে ভয়-ভীতি দেখাতেন, কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন। আখিরাত-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাকে সতর্ক করতেন। ইবনু হুবাইরার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত এবং তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে, আমাদের মনে হতো তিনি হয়তো কাঁদতে কাঁদতে মারাই যাবেন। ইবন হুবাইরাহ আল্লাহর ভয়ে এত বেশি কাঁদতেন যে, আমরা ভাবতাম, তিনি বুঝি মারা যাবেন।

সুতরাং আবু হানিফা যাদের অনুসরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তারা আজকের এসব নেতাদের মতো না, যারা খোদ মক্কা থেকে কুফর প্রচার করে, যারা পবিত্র ভূমি থেকে ইন্টারফেইথের[৬৯] দাওয়াহর প্রতি আহ্বান করে।

উমাইয়্যাহ ও আব্বাসি খিলাফাহর সময় আবু হানিফা যে অবস্থান নিয়েছিলেন আজ মানুষের সামনে তা তুলে ধরলে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে? আবু হানিফার নাম

---

৬৭ রব্বানি আলিমগণ : যারা শুধু তাঁদের রবকেই ভয় করেন। তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই সত্যকে সমুন্নত করার প্রয়াস চালান।

৬৮ উলামা আদদুনিয়া: জনসমর্থন, জনপ্রিয়তা, সম্মান, মর্যাদা, অর্থ তথা দুনিয়ার পেছনে ছোটা আলিম। উলামা আস্‌সালাতিন : শাসকের পদলেহী নামধারী আলিম।

৬৯ ইন্টারফেইথ বা ইন্টারফেইথ ডায়ালগ : আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপ। এজাতীয় কার্যকলাপকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক বুলি প্রচলিত থাকলেও আসলে আন্তধর্মীয় সমাবেশ, সম্প্রীতি ও সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হল, "সকল ধর্ম সমান", "সকল ধর্ম সঠিক", "সকল পথই একই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়", "সকল ধর্ম এক" – এমন একটি দর্শনের প্রচার। এটি নির্জলা কুফর ও শিরক এবং বর্তমানের ইন্টারফেইথ আন্দোলন মূলত ফ্রিম্যাসনিক "এক ধর্ম, এক বিশ্ব" এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, ইসলাম ছাড়া আর কোন সঠিক ধর্ম নেই। ঈমান ও কুফর, তাওহিদ ও শিরক, মুসলিম ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না। আলিমদের মতে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপের এ আহ্বান হল মূলত রিদ্দার আহ্বান। এ ব্যাপারে আরো জানতে দেখুন - https://islamqa.info/en/10213 এবং লাজনাহ আদ দাইমাহর ফাতওয়া নাম্বার ১৭,৩০০

সরিয়ে দিন, উমাইয়্যাহ ও আব্বাসি খিলাফাহর নাম সরিয়ে দিন। তারপর ইমাম আবু হানিফার এ অবস্থানের কথা যে কারও সামনে তুলে ধরুন। যদি আবু হানিফা এবং শাসকদের নাম গোপন রেখে বাতিলপন্থী মুরজিয়াদের সামনে এই ঘটনা তুলে ধরেন, তারা কী বলবে জানেন? তারা বলবে শাসকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এই লোক তো খারিজি। আর তারপর তাদের মধ্যকার কোনো ১২ বছর বয়সীকে ২০ পৃষ্ঠার যুক্তিখণ্ডন লিখতে বসিয়ে দেবে! আর যখন আপনি বলবেন, কিন্তু এটা তো ইমাম আবু হানিফা! তখন তারা পিছু হটবে, আর বলবে ইমাম বারবাহারি ﷺ কোনো মুবতাদির সাথে বিতর্ক করতে মানা করেছেন, আর তুমি একজন মুবতাদি। এই হলো তাদের পন্থা, এই হলো তাদের মানহাজ। আর এভাবেই তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

আমি অ্যামেরিকান এক দা'ঈর বক্তব্যের কিছু অংশ শুনেছিলাম। সে একজন বড় আলিমের নামে মিথ্যাচার করছিল। সে বলছিল ইবনু উসাইমিন ﷺ এবং সালমান আল-আওদাহ উক্ত ব্যক্তিকে খারিজি গণ্য করতেন। এটা ছিল ডাহা মিথ্যা, ইবনু উসাইমিন উক্ত আলিমকে কখনোই খারিজি বলেননি। এই মর্ডানিস্টরা নিজেদের স্বার্থে ইবনু উসাইমিনের নাম ব্যবহার করে। কাউকে খারিজি প্রমাণ করার সময় এই মর্ডানিস্টরা ইবনু উসাইমিনের উদ্ধৃতি দেয়, কিন্তু তারা কেন ইবনু উসাইমিনের রচনাবলি থেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র ব্যাপারে তাঁর অবস্থান তুলে ধরে না? তারা কেন ইবনু উসাইমিনের ওই কথাগুলো প্রচার করে না, যেগুলো সরাসরি তাদের ভ্রান্ত মর্ডানিস্ট আকিদাহ ও জান্নাত-জাহান্নামের প্রশ্নের সাথে যুক্ত?

আমার মনে আছে, আমি একবার এক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করছিলাম। ওয়াল্লাহি, ওয়াল্লাহিল আযিম। লোকটি ছিল আমার পাশে, আর তার স্ত্রী ছিল ডাইনিং রুমের পর্দার আড়ালে। তাদের মাঝে ঝগড়া চলছিল এবং আমরা তাদের সমস্যাগুলোর মীমাংসা করার চেষ্টা করছিলাম। প্রায় বারো বছর আগের কথা। কথায় কথায় এমন অনেক বিষয় উঠে এল যা সরাসরি মূল বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত ছিল না। মহিলাটি বললেন, শাইখ আমি এই ব্যক্তির ওপর আমার হক সম্পর্কে জানি এবং আমি এটাও জানি যে আমার তার আনুগত্য করা উচিত। আমার মনে নেই ঠিক কোন প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, তবে একপর্যায়ে মহিলাটি বললেন, শাইখ আমি জানি যে, পায়ুসঙ্গম হারাম। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে এর জন্য আদেশ করলে আমি মেনে নিই, কারণ আমি জানি আমার উচিত স্বামীর আনুগত্য করা। আমি জানি নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয় এমন জায়গায় অবস্থান করা ও তাদের সাথে কথা বলা

হারাম। কিন্তু সে যখন আমাকে এগুলো করতে বলে, আমি করি। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামীর আনুগত্য করতে বলেছেন।

মাশাআল্লাহ! নতুন এক ফিকহ! সে এখন ফাকিহাহ হয়ে গেছে। আল্লাহর ﷻ চেয়ে স্বামীর আনুগত্য বড় হয়ে গেছে। এই কোমলমনা নারী স্বামীর প্রতি আনুগত্যের এত বেশিসংখ্যক হাদিস শুনেছে যে, তার মনে হয়েছে স্বামীর আনুগত্য করা আল্লাহ ﷻ ও রাসূলুল্লাহর ﷺ আনুগত্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

আমি এই ফাকিহাহর দিকে তাকিয়ে বললাম, মাশাআল্লাহ। আমরা তো নতুন এক মাসআলা জানলাম—স্বামীর আদেশ আল্লাহর ﷻ আদেশকে রহিত করে দেয়। আসলে সে স্বামীর প্রতি আনুগত্যের এত বেশিসংখ্যক হাদিস শুনেছে যে, তার মনে হয়েছে স্বামীর আদেশ অন্য সব আদেশের ওপর প্রাধান্য পাবে। মহিলাটির জন্ম অ্যামেরিকাতে এবং স্বাভাবিকভাবেই সে খুব একটা আরবি বলতে পারে না। এ রকম একজন স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন মহিলাকে তেমন দোষারোপও করা যায় না। পরে তার ভুল শুধরে দেওয়া হয় এবং সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। আল্লাহ ﷻ তাকে ও তার স্বামীকে বারাকাহ দান করুন।

এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে, আজকের মুরজিয়া, শাসকদের অনুগত আলিম (উলামা আস্‌সালাতিন) এবং মর্ডানিস্টদের যুক্তি হলো এই মহিলাটির যুক্তির মতো। তারা হুবহু এই একই যুক্তিই ব্যবহার করে। তথাকথিত এসব আলিমগণ সত্যিকার অর্থেই এমন দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। আপনি দেখবেন যে, তারা ঘুরেফিরে প্রতিনিয়ত কেবল সেই একই বুলি আওড়াতে থাকে, 'শাসকদের আনুগত্য করতে হবে', 'শাসকদের কাছে নতিস্বীকার' ইত্যাদি। যখনই আপনি এদের কথা শুনবেন, এই মহিলার দেয়া যুক্তির কথা চিন্তা করবেন। একই জিনিস। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, মহিলাটি ছিল অজ্ঞ আর এরা হলো জ্ঞানসম্পন্ন। আর এরা জানে, তারা আসলে কী করছে।

আপনাদের একটি বাস্তব উদাহরণ দিই। আয়াদ আল কারনি। তিনি কারাবন্দী ও নির্যাতিত তিন জন আলিমের জবানবন্দি নিয়েছিলেন। এই আলিমদের ওপর কারাগারে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছিল। এই অত্যাচার, নির্যাতন আর হুমকির পর আয়াদ আল-কারনি কারাগারের ভেতরে গিয়ে তাদের কাছ থেকে জবানবন্দি আদায় করলেন। দাবি করা হয় সেই জবানবন্দিতে এই আলিমগণ[৫০] তাদের

[৫০] এই তিন জন আলিম হলেন শাইখ নাসির আল ফাহদ, শাইখ আলি আল খুদাইর, আহমাদ আল-খালিদি। আল্লাহ তাঁদের সত্যের ওপর দৃঢ় রাখুন এবং কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

আগেকার অবস্থান থেকে সরে আসার কথা বলেছিলেন। কয়েক মাস পর আয়ায আল-কারনি আল-জাজিরাতে আসলেন। সাক্ষাৎকারে প্রায় ক্লিনশেইভড এক রিপোর্টার তাকে প্রশ্ন করল, আপনি কীভাবে এমন একটি কাজে সম্মত হলেন? আয়ায আল কারনি কী উত্তর দিলেন? তিনি সেই মহিলার মতো একই উত্তর দিলেন—ওয়ালিউল আমর আমাকে এটা করতে বলেছেন।

পায়ুসঙ্গমকে বৈধ প্রমাণে মহিলাটি যে যুক্তি দেখিয়েছিল, আয়ায আল-কারনির যুক্তি হুবহু একই। স্বামী তাকে হারাম কাজের আদেশ দিয়েছে, যেহেতু স্বামীর আনুগত্য করতে হবে, তাই সে আনুগত্য করেছে। ঠিক একইভাবে বাদশাহ তাকে বলেছে কারাগারে গিয়ে নির্যাতিত এই আলিমদের জেরা করতে, এই পুরো প্রক্রিয়ার অংশ হতে। শাসকের আনুগত্য করতে হবে, তাই সে আনুগত্য করেছে। এই হলো তার যুক্তি।

শাসক বলেছে তাই আপনি আপনার ভাইয়ের ওপর শাস্তি, নির্যাতন আর অত্যাচারের অংশ হবেন? তাহলে স্বামীর আদেশে পায়ুসঙ্গম করা ওই মহিলা আর এই আলিমের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

ইমাম আবু হানিফা কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলে, সে যদি আমাকে শুধু ওয়াসিলের মসজিদগুলোর দরজাও গুনতে বলে, আমি করব না। যে কাজ করায় কোনো বাধা নেই, আমি তার জন্য সেটাও করব না। অন্য কিছু তো দূরের কথা। এই হলো ইমাম আবু হানিফা। তিনি কি খারিজি ছিলেন? তাদের প্রশ্ন করুন, ইমাম আবু হানিফা খারিজি ছিলেন কি না।

আরেকটি উদাহরণ হলো দুনিয়াজুড়ে টিভির এক পরিচিত মুখ। তার চোখে সব সময় পানি লেগেই থাকে, কারণ তার হৃদয় নাকি কুরআনের আয়াত দ্বারা আন্দোলিত হতে থাকে। এই সপ্তাহে এক প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে সে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে গেছে ইন্টারফেইথের প্রচারের জন্য। তার চোখের পানি এখন কোথায় গেল? চোখের পানি যদি সঠিক আকিদাহর বুঝ না দিতে পারে, তাহলে সেটার কোনো মূল্য নেই। সে কেন সেখানে গেছে? তার জবাবও ওই মহিলার উত্তরের মতো, যে বলেছিল পায়ুসঙ্গম বৈধ, যেহেতু এটা আমার স্বামীর আদেশ। তিনি সেখানে গেছেন কারণ ওয়ালিউল-আমর তাকে বলেছে, ভিয়েনাতে যাও আর ইন্টারফেইথ প্রচার করো।

বহু বছর আগে ইবনু বায ﷺ এবং লাজনাহ আদ-দাইমাহ একটি ফাতওয়া দিয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল ইন্টারফেইথ হলো কুফরি। কীভাবে হঠাৎ করে সেটা ইসলামের দিকে আহ্বান ও ইসলামের দিকে দাওয়াহর অংশ হয়ে গেল? এক সময় যেটাকে

কুফরের দিকে আহ্বান বলা হতো, আজ সেটা কীভাবে ইসলাম প্রচারের আদর্শ পন্থা হয়ে গেল? পরিবর্তনটা কোথায় হলো? ফাতওয়া নম্বর ১৭,৩০০ আপনারা দেখে নিতে পারেন। ইবনু বায, বকর আবু যাইদ, আলুশ শাইখ এবং ফাওযান এতে স্বাক্ষর করেছেন। আপনারা এই ফাতওয়ার ৮ নম্বর পয়েন্টটি দেখতে পারেন। এতে বলা হয়েছে, যদি কোনো মুসলিম ইন্টারফেইথের দিকে আহ্বান করে, তবে সে রিদ্দার প্রতি আহ্বানকারী হবে এবং এটা তাকে মুরতাদে পরিণত করতে পারে। এটা ছিল তাদের নিজেদের, উচ্চপদস্থ, রাষ্ট্রীয় আলিমদের দেওয়া ফাতওয়া। তাহলে পরিবর্তনটা কোথায় হলো? আর এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে?

কেউ কেউ পরিভাষা নিয়ে খেলার চেষ্টা করে। তারা বলে ইন্টারফেইথ হলো মতবিনিময়, সংলাপ, দাওয়াহ। সবাই দাওয়াহর পক্ষে, কেউ এতে বিরোধিতা করবে না। কিন্তু দাওয়াহ আর ইন্টারফেইথের মধ্যে পার্থক্য আছে। আল-ফাওযান, আর-রাজিহি, গুনাইমান, আস-সালিহ, আল-মাহমুদ এবং আল-বাররাক প্রত্যেকেই ফাতওয়া দিয়েছেন যে, ইন্টারফেইথ হলো কুফরের দিকে আহ্বান। এটা তাদেরই আলিমদের ফাতওয়া। ইন্টারফেইথকে কুফর বলার কারণে যখন আল-বাররাককে কাঠগড়ায় নেওয়ার উপক্রম হয়, ২০ জনেরও বেশি অভিজ্ঞ, স্বনামধন্য আলিম ফাতওয়া প্রদান করে তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। তারা ফাতওয়া দেন যে আল-বাররাক ইন্টারফেইথের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন তা হলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য।

ইন্টারফেইথ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করা এই ব্যক্তিকে বছর খানেক আগে সরাসরি অনুষ্ঠানে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি বাদশাহ আব্দুল্লাহ ও তার কার্যকলাপের ব্যাপারে কেন কিছু বলেন না? প্রশ্নকর্তা বিশেষভাবে ইন্টারফেইথের কথা বলছিলেন। আপনারা হয়তো জানেন না, ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হবার বদলে মক্কা এখন ইন্টারফেইথ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এই শাইখ নিজের ভুল স্বীকার করতে পারত। সে কমসেকম প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু সে বলল, না, না, নাজরানের খ্রিষ্টানরা রাসুলুল্লাহর ﷺ কাছে মসজিদে নববিতে দেখা করতে এসেছিলেন এবং তারা পশ্চিম দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে চাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ তাদের বাধা দেননি। তারা রাসুলুল্লাহর ﷺ মসজিদে পশ্চিম দিকে মুখ করে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ইবাদত করেছিল। ঘটনাটি ইবনু কাসির ও ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন।

এটা ছিল প্রায় এক বছর আগের কথা। সম্ভবত এ ধরনের যুক্তি দিতে পারার কারণেই অস্ট্রিয়াতে পাঠানোর সময় তাকে প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

ইবনু কাসির ﵀ ও ইবনু ইসহাকের ﵀ বর্ণিত উক্ত ঘটনা সম্পর্কে যারাই মন্তব্য করেছেন প্রত্যেকে বলেছেন, এই বর্ণনার সনদ মুদ্বাল (معضل)। সনদ মুদ্বাল হবার অর্থ পর পর দুজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ ঘটনাটি মুহাম্মাদ ইবনু জাফর আয-যুবাইর ﵀ তাবিয়িদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তার ঠিক পর পর দুজন বর্ণনাকারী নিখোঁজ। আমরা এ ধরনের হাদিসকে কোনো ক্ষেত্রেই গ্রহণ করতে পারি না। মুদ্বাল মুনকাতির মতোই। যখন কোনো বর্ণনায় পর পর দুজন রাবি নিখোঁজ থাকে, তখন একে মুদ্বাল বলা হয়। আর যদি সম্পূর্ণ ইসনাদ জুড়ে, পর পর না, এক বা দুজন রাবি অনুপস্থিত থাকে তবে সেটাকে বলা হয় মুরসাল হাদিস। মুদ্বালের ক্ষেত্রে পর পর দুজন বর্ণনাকারী নিখোঁজ থাকে। ইমাম যাহাবি ﵀ মুদ্বালের বিষয়ে বলেছেন, এ ধরনের হাদিস কেউ ব্যবহার করেছে এমনটা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একমাত্র কুফরের প্রচার ছাড়া আর কখনো এ ধরনের বর্ণনা ব্যবহার করা হয় না।। কিন্তু আজ হঠাৎ এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ শাসকরা তেমনই চেয়েছেন। এদের যুক্তিও ওই মহিলার মতোই; বরং তার চেয়েও একধাপ এগিয়ে। আর বাকি আলিমরাই বা কোথায়? তারা কেন বলছেন না যে এ বর্ণনাটি মুদ্বাল? অন্য কোনো প্রসঙ্গ হলে তারা তো ঠিকই বলতেন এই লোকটি একটি দুর্বল ও জাল বর্ণনা উল্লেখ করেছে, এটা রাসুলুল্লাহর ﷺ সাথে যুক্ত করা যায় না।

হে মুসলিমগণ, চিন্তা করুন। হকপন্থী আলিমদের কীভাবে চিনবেন? দেখুন কারা শাসকদের দাস আর কারা রাহমানের দাস। দেখুন কারা জনপ্রিয়তার গোলাম আর কারা আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব। এই দ্বীন আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সুতরাং এমন আলিমদের কাছ থেকে দ্বীনের শিক্ষা নিন যারা সত্যিকারভাবেই আল্লাহকে ﷻ ভয় করেন। দেখুন কারা অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধির মোহে বিক্রি হয়ে গেছে, আর কারা একমাত্র আল্লাহরই ﷻ অনুসরণ করে।

ইমাম আবু হানিফা ﵀ মৃত্যুবরণ করেন বন্দী অবস্থায়। এটাই সত্যনিষ্ঠদের পথ। কারাগারের এ পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হয়, আবার কেউ পারেন না। কিন্তু হকপন্থীরা সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকেন। মধ্যস্থতাকারীরা যখন আবু হানিফার কাছে গিয়েছিল, তখন তাঁকে দোররা মারা হচ্ছিল। সেই অবস্থায়ও তিনি বলেছিলেন— জাহান্নামে উত্তপ্ত লোহার হাতুড়ির আঘাতের চেয়ে দোররার আঘাত সহ্য করা আমার জন্য সহজ। আল্লাহর কসম, সে যদি আমাকে মেরেও ফেলে, আমি এই পদ গ্রহণ করব না। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ

'এবং তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি।'[৫১]

ইমাম আবু হানিফা বলেছিলেন,

'দুনিয়ার এই শাস্তি আখিরাতের লোহার হাতুড়ি থেকে কত দুর্বল!'[৫২]

আবু হানিফা মক্কায় পালিয়ে যান এবং শাসনক্ষমতা পরিবর্তিত হয়ে আবু জাফর আল-মানসুরের কাছে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। অতঃপর যখন আবু জাফর তাঁকে বন্দী করলেন তখনো তিনি দৃঢ়, অবিচল থাকলেন। এই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ইমাম আবু হানিফা ﵀।

মনে রাখবেন, শাসকরা কখনো ইলমসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে ইলম প্রচার করতে দেয় না, যদি না সেই ইলম তাদের ক্ষমতা ও মসনদ টিকিয়ে রাখতে কাজে আসে।

---

[৫১] সূরা আল হাজ্জ, ২২ : ২১

[৫২] জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ: ২/১৮০

শাইখ নাসির আল ফাহ্‌দ। আলে সৌদের কারাগারে বন্দী। তাঁর কথা বিভিন্ন সময় আমি ক্লাসে বলেছি। বাবা আর আমি জেল থেকে ছাড়া পাবার পর আমাদের অভিনন্দন আর মায়ের জন্য দু'আ জানিয়ে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সৌদি কারাগারে বন্দী অবস্থাতেও আমাদের অবস্থা জানার পর তিনি চিঠি দিয়েছিলেন। তাই আজ আমি আপনাদের তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা তাঁকে নিজেদের দু'আয় স্মরণ করবেন। আল্লাহ ﷻ যেন তার কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে একটি ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে। আর এ উপলক্ষেই তাকে নিয়ে কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা।

শায়খ নাসির আল ফাহ্‌দ কে? তাঁর প্রথম পরিচয়—তিনি একজন আলিম, কোনো সাধারণ মানুষ নন। তিনি একজন শাইখ এবং ইন শা আল্লাহ বর্তমান সময়ের একজন ইমাম। আমার ইচ্ছা ছিল নবি ইউসুফের ﷺ পাঠশালার তৃতীয় পর্বটির মূল অংশটি তাঁকে নিয়েই সাজানোর। কিন্তু জাযিরার কিছু ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করে একটি অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ কাজে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন। হয়তো আমাদের কাছে একে খুব তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এটা অনেক বড় একটি কাজ। কারণ, প্রথমত আল্লাহ ﷻ —যিনি প্রতিটি শস্যদানা, প্রতিটি অণু পরিমাণ আমলের ওজন করেন এবং আপনার আমলনামায় যুক্ত করেন—তাঁর কাছে এটা বড়। আপনার কাছে একে ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ﷻ কাছে এ কাজের গুরুত্ব অনেক। এ কাজের জন্যই হয়তো বিচারের দিন আপনার ডানদিকের পাল্লা ভারী হবে এবং আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। হয়তো এ মানুষটির প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা বিচারের দিনে আল্লাহর ﷻ সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনার জন্য দয়া ও অনুকম্পার কারণ হবে।

এ কাজটি কী? কাজটি হলো শাইখের মুক্তি ও বন্দী অবস্থায় তার ওপর চালানো নির্যাতনের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে, এতে অংশগ্রহণ করা।

আমি দ্রুত, সংক্ষেপে তার জীবনী তুলে ধরছি। তিনি গ্র্যাজুয়েট করেছেন রিয়াদের জামিয়াতুল ইমাম (ইমাম সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে। গ্র্যাজুয়েশানের পর পরই তাকে এই ইউনিভার্সিটির আকিদাহ বিভাগের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি অনেক শাইখের কাছে শেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাই মনে করবেন না তিনি হঠাৎ করে ইউটিউবে উদয় হওয়া কোনো ভুঁইফোড় লোক। শাইখ নাসির হলেন গভীর ইলমসম্পন্ন একজন সত্যিকারের আলিম এবং অসংখ্য আলিমের ছাত্র। তার শিক্ষকদের মধ্যে আছেন—শাইখ আবদুল আযিয আর-রাজিহি, ফাররাজ, আত্তরাম, দুআইশ এবং আস-সিদহান। সৌদির বর্তমান যে মুফতি, তিনিও শাইখ নাসিরের শিক্ষকদের একজন।

শাইখ নাসির আল-ফাহ্দ হাদিসের নয়টি কিতাব মুখস্থ করেছেন। আমি নয়টি খণ্ড মুখস্থ করার কথা বলছি না। তিনি নয়টি হাদিস-সংকলন মুখস্থ করেছেন, আর এ প্রত্যেকটির কয়েকটি করে খণ্ড আছে। যেমন *সহিহ বুখারি*-র একাধিক খণ্ড আছে। *সহিহ মুসলিমে*-র একাধিক খণ্ড আছে। উনি এ সবগুলো খণ্ড মুখস্থ করেছেন। এভাবে *সুনান আবি দাউদ, তিরমিযি, আন-নাসায়ি, ইবনু মাজাহ, মুসনাদ আহমাদ, মুয়াত্তা মালিক, দারিমী*—প্রতিটি সংকলনের প্রতিটি খণ্ড তিনি মুখস্থ করেছেন। শুধু তা-ই না, তিনি এ হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা শুধু শেখেনইনি; বরং মুখস্থও করেছেন। এ ছাড়া ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে ২০টি অত্যাবশ্যকীয় কিতাব তিনি মুখস্থ করেছেন, যার মধ্যে কিছু হলো আকিদাহর আর কিছু হলো ফিকহের। এগুলো মুখস্থ করার পাশাপাশি তিনি এগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা শিখেছেন। অর্থাৎ হাদিসের নয়টি সংকলনের পাশাপাশি আকিদাহ ও ফিকহের ২০টি অপরিহার্য কিতাব তিনি মুখস্থ ও আত্মস্থ করেছেন। এ ছাড়া বন্দী অবস্থায় তিনি ৬৫টি বই লিখেছেন। এ তথ্যগুলো নির্ভরযোগ্য। তথ্যগুলোর ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত না হলে, আমি বলতাম না।

কিছু কিছু ব্যাপারে তার সাথে আপনার মতপার্থক্য থাকতে পারে। রাসূলুল্লাহর ﷺ পর আর কেউই মাসুম না, তিনিও নন। কিন্তু এখন এগুলো আলোচনার সময় না। এখন তিনি একজন মুমিন, যিনি বন্দী অবস্থায় নির্যাতিত হচ্ছেন। যদি তার কোনো ফাতওয়ার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি থাকে, তাহলে এখন সেটা নিয়ে আলোচনার উপযুক্ত সময় না। যখন তিনি মুক্ত হবেন, আপনার সাথে বিতর্ক করতে পারবেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন, তখন তাকে গিয়ে বলুন, শাইখ! আপনার এই

এই মতের সাথে আমি একমত না। শাইখ নাসির সব সময় বিরোধিতাকারীদের বিতর্কের জন্য আহ্বান করেছেন। বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশে তিনি সব সময় দুটো জিনিস বলতেন—এসো আমরা বিতর্ক করি আর চলো আমরা মুবাহালা[৫৩] করি। কারাগারের প্রাচীরের ভেতরে এবং বাইরে থেকে বেশ কয়েকবার তিনি এ কথা বলেছেন। যখন তিনি মুক্ত হবেন, আপনি তার কাছে গিয়ে আপনার আপত্তির কথা বলুন, তার সাথে তর্ক করুন। আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম হোক বা মাযলুম।'[৫৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যালিম অথবা মাযলুম।

এ কথা শুনে আনাস ইবনু মালিক ﷺ প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! মাযলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু যালিমকে কি করে সাহায্য করবো?" সবচেয়ে সুভাষী গোত্রের সন্তান, পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে স্পষ্টভাষী মানুষটি ﷺ কেন এমনভাবে কথাটি বললেন যার কারণে প্রথমে আনাস ﷺ বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন না? তাঁর ﷺ বাচনভঙ্গি এতই নম্র, স্পষ্ট এবং এবং ধীরগতির ছিল, কথা শেষে তিনি কোনো জায়গা ছেড়ে যাবার আগেই শ্রোতা শব্দ গুনে গুনে তাঁর ﷺ কথা মুখস্থ করে ফেলতে পারত। এমন একজন মানুষ কেন এভাবে কথাটা বললেন?

যেন আমরা মনে না করি মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারীর পক্ষে অবস্থান নেওয়া যায়। আপনার ভাই যদি ভুলও করে থাকে তবুও আপনার প্রথম দায়িত্ব হলো তাকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা। তারপর আপনি তার ভুল শুধরে দিন। যদি সে নির্যাতিত হয়, তাহলে আগে তাকে মুক্ত করুন, তারপর তাকে দিকনির্দেশনা দিন। যখন আপনার ভাই নির্যাতিত তখন আপনি চাবুকধারীর কাছে গিয়ে বলবেন না, "তাকে আরও দশ ঘা লাগিয়ে দাও, তাকে আরও দশ বছর জেল দাও। কারণ, সে

---

[৫৩] মুবাহালা : হক ও বাতিলের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে, বাতিলপন্থীর সামনে যাবতীয় দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরও সে যদি হঠকারিতা করে, তবে তাকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করা হবে। তার নিয়ম হচ্ছে, উভয় পক্ষ নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততিকে উপস্থিত করবে, এরপর প্রত্যেক পক্ষ বলবে, আমরা যদি বাতিলপন্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তবে মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লানত। এটাকেই বলে মুবাহালা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সূরা আল ইমরানের ৬১ নম্বর আয়াত এবং তার তাফসিরে।

[৫৪] *বুখারি*, হাদিস নং : ২৪৪৩

অমুক অমুক ব্যাপারে ভুল মত দিয়েছ।" তাকে সাহায্য করুন, তার বুক বরং যুলুম থেকে তাকে বের করে আনুন। তারপর ভুলগুলো শুধরে দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন অত্যাচার না করে, বরং তিনি ﷺ বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম হোক বা মাযলুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন বললেন অত্যাচারীকেও সাহায্য করতে? তাই আনাস ইবনু মালিক রা. প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! মাযলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু যালিমকে কি করে সাহায্য করবো?" রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, তোমার ভাইয়ের কাছে যাও এবং তাকে যুলুম করা থেকে থামাও।

তিনি ﷺ বলেছেন, তোমার ভাইয়ের কাছে যাও। তিনি ﷺ বলেননি, তার ওপর যে অত্যাচার করছে, তার ওপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে, যে তাকে বন্দী করেছে তার কাছে যাও।

যারা সৌদির জেলে ছিল তাদের জিজ্ঞেস করে দেখুন কতবার জেলের গুন্ডাবাহিনী শাইখ নাসিরের ওপর চড়াও হয়েছে। এই গুন্ডাবাহিনী হলো বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু অফিসার, যাদের কাজ হলো অবাধ্য বন্দীদের শায়েস্তা করা। এরা গায়েগতরে খুব বড়সড় আর শক্তিশালী হয়। কোনো বন্দীকে শায়েস্তা করার সময় এদের বেশ কয়েকজন দাঙ্গা পুলিশের মতো হেলমেট, প্যাড পড়ে, লাঠিসোঁটা আর বর্ম নিয়ে বন্দীর সেলে ঢোকে। এই গুন্ডাবাহিনী নিয়মিত শাইখ নাসির আল-ফাহ্দের ওপর নির্যাতন চালায়, তার হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখে। চিন্তা করুন, বিশালদেহী, অস্ত্রে সজ্জিত গুন্ডাবাহিনী এই ছোটখাটো মানুষটার ওপর চড়াও হচ্ছে। এত সাজসজ্জা, এত আয়োজন, এতকিছু একজন আলিমের জন্য। এমন একজন মানুষ, যিনি হাদিসের নয়টি কিতাব মুখস্থ করেছেন। আপনারা কি মনে করেন গুন্ডাবাহিনী তার সেলে গিয়ে তার ওপর অত্যাচার করছে কারণ তিনি অভদ্র? তিনি উচ্ছৃঙ্খল? তিনি জেলের মধ্যে ঝামেলা করেন?

হাজ্জায বিন ইউসুফ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। কিন্তু দুজনের কাছে সে পরাস্ত হয়েছিল। প্রথমজন ছিল তার একজন শত্রু, আর অন্যজন ছিল গাযালাহ আল-খারিজিয়্যাহ নামের এক মহিলা। হাজ্জায তার শত্রুর মুখোমুখি হওয়া থেকে পিছু হটেছিল। এ ঘটনার পর গাযালাহ আল-খারিজিয়্যাহ নামের এক মহিলা সব জায়গায় তার পিছু পিছু গিয়ে নানাভাবে তাকে অপমান করতে শুরু করল। এক সময় এমন অবস্থা হলো যে হাজ্জায এ মহিলাকে দেখলে পালিয়ে যেত। প্রথমে হাজ্জায শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে পালাল, আর তারপর সে এক নারীর কাছ থেকে পালাতে শুরু করল।

ওমরান আশ-শায়বানি ছিলেন একজন কবি। ৮৫ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। এ দুটো ঘটনার পর হাজ্জাযকে তাচ্ছিল্য করে ওমরান দু-লাইনের কবিতা লিখলেন :

أَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَةٌ — فَتْخَاءُ تَنْفُرُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ

আমাদের সামনে সিংহ, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে উটপাখি!

ওমরান হাজ্জাযকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, কেন শত্রুর মুখোমুখি হতে ভয় পাও, কেন খাযালাহর সামনেও তুমি দাঁড়াতে পারো না? যখন খাযালাহ সামনে আসে, তুমি পুঁচকে পাখির মতো পালাও। যখন শত্রু সামনে আসে, তুমি উটপাখির মতো পালাও। কেন?

অথচ এই হাজ্জায তার অধীনস্থ মুসলিমদের ওপর অত্যাচার করছিল, তাদের বন্দী এবং হত্যা করছিল। আজকের অবস্থা দেখুন, এরা একই কাজ করছে। এই সৌদিরা ইরানের কাছ থেকে পালাচ্ছে। যারা নিজেদের সীমান্তের ভেতরে প্রকাশ্যে আবু বাকর এবং উমারকে অভিশাপ দেওয়া সেই রাফিদাদের পায়ে এরা চুমু খাচ্ছে, যেকোনো উপায়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছে। চলো সংলাপ করি! রাফিদারা যা চায়, সংলাপের জন্য এরা তার সবই দিচ্ছে। যখন রাফিদাদের কেউ সৌদিতে বন্দী হয়, জেলে তাকে সেরা চিকিৎসা ও থাকার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। তার সাথে ভালো আচরণ করা হয়, আর এক সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমা পেয়ে সে বের হয়ে যায়। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসারীদের ওপর গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়।

অন্যদিকে যারা দ্বীনের বাহ্যিক শত্রু—সেই কাফির আসলিদের সাথে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় বসে ঠিক এই মুহূর্তে তারা ইন্টারফেইথের কুফর প্রচার করছে। অথচ তাদের নিজস্ব আলিমরাই এই ইন্টারফেইথকে কুফরের আহ্বান বলে ঘোষণা দিয়েছিল। একদিকে তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে বসে কুফরের দিকে আহ্বান করে, অন্যদিকে শাইখ নাসির আল-ফাহ্দের মতো আলিমকে হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে উপুড় করে ফেলে রাখে। উপুড় করে শুইয়ে তাকে কারাগারের করিডোরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে তার মুখ মাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারও মুখের ওপর পা তোলা হচ্ছে—মুসলিম কিংবা কাফির—এটা কি কোনো মানুষের প্রাপ্য হতে পারে? যে মুখ হাদিসের নয়টি কিতাব মুখস্থ করেছে সেটার ওপর কারও জুতা, কারও পা শোভা পায়? যে মাথা হাদিসের নয়টি কিতাব ধারণ করে

আছে, তার ওপর কি গুন্ডাবাহিনীর বুট শোভা পায়? এটাই কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর উম্মাহ?

শাইখ নাসির আল-ফাহদকে মাটিতে ছুড়ে ফেলা হয়। তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকেন। তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে তার হাত আর পা পিছমোড়া করে একসাথে বেঁধে দেওয়া হয়। কল্পনা করুন, তিনি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আর তার হাত-পা পেছনে একসাথে বেঁধে দেওয়া। সারাদিন তাঁকে এভাবে সেলে ফেলে রাখা হয়। একবার অনেক কষ্টে তিনি ডান হাতের বাঁধন ছোটাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার বাম হাত ছোটাতে পারেননি, কারণ ওটা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তারপর টানা এক মাস তার বাম হাত অবশ অবস্থায় ছিল। এখনো তার বাম হাতের বুড়ো আঙুল সম্পূর্ণভাবে অনুভূতিশূন্য। আপনারা জানেন, যখন শরীরের কোনো অংশ দীর্ঘসময় জুড়ে অবশ হয়ে থাকে তখন অনেক সময় সেটা স্থায়ীভাবে অনুভূতিশূন্য হয়ে যায়।

কোনোরকমের চিকিৎসা তাঁকে দেয়া হয় না। তাঁকে বাধ্য করা হয় উত্তপ্ত ধাতুর পাতের ওপর বসে থাকতে। একবার প্রচণ্ড গরম ধাতুর ওপর তাকে টানা চার ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। এ ঘটনার পর তিনি এতটাই অসুস্থ পড়েছিলেন যে বেশ কিছুদিন তিনি শুধু চোখের ইশারায় নামায পড়তে বাধ্য হন। বাথরুমে যাবার সময় বুকের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জানিয়েছেন, একটি বিড়ালকে বন্দী করে রাখার জন্য একজন মহিলাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে। তাহলে যারা একজন ইমামের ওপর অত্যাচার চালায়, তাদের কী অবস্থা হবে? আমি প্রত্যেক মুসলিমকে প্রশ্ন করতে চাই, যদি আপনি কোনো মানুষকে দেখেন—না মানুষ না, যদি আপনি দেখেন কোনো কুকুরের হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে—আপনি কি সেটাকে ওই অবস্থায় ফেলে রাখবেন? আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর ﷻ দোহাই দিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছি। আমরা আপনাদের আহ্বান করছি একজন মানুষকে মুক্ত করার জন্য।

ধাতব চেয়ারে চার ঘণ্টা বসিয়ে রাখার পর তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তারা কোনো চিকিৎসা করায়নি। টানা পাঁচ দিন তার খাওয়া বন্ধ ছিল। তিনি কোনো কিছু খেতে পারছিলেন না, পান করতে পারছিলেন না। আর যখন তিনি মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন, তারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। যাতে করে তাকে কিছুটা সুস্থ করে তুলে আবার নির্যাতন শুরু করা যায়। ৯ বছর ধরে তিনি বন্দী।[৫৫] ৬ বছর

[৫৫] এ বক্তব্যটি ২০১২ সালের। বর্তমানে শাইখ ১৫ বছর ধরে সৌদি কারাগারে বন্দী। আল্লাহ তাঁকে হকের ওপর দৃঢ় রাখুন, তাঁর কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

ধরে পরিবারের সাথে তার যোগাযোগ বন্ধ। এ ছয় বছরে কেউ তাকে দেখেনি, তার কণ্ঠ শোনেনি। অনেক সময় বন্দীদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিন আগে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া এক ভাই বলেছেন, শাইখ নাসিরের সাথে আমার কোর্টে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি জানি ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো কারাগারেই আমার মৃত্যু হবে।

যদি তিনি কারাগারে মারা যান, তাহলে তাঁর জন্য সেটা হবে মর্যাদার মৃত্যু। কিন্তু আমাদের কী হবে? সোশাল মিডিয়ার আমাদের একটা ছোট্ট লেখা হয়তো তাঁর উপকারে আসবে। এর বেশি কিছু চাওয়া হচ্ছে না। তার সমর্থনে অল্প কিছু কথা, ব্যস! অথচ এটুকুও আমরা করতে পারি না। আলহামদুলিল্লাহ, আমি কখনো নিজের জন্য কোনো কিছু চাইনি। কেউ বলতে পারবে না যে স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা দুর্দশার সময় আমি দাওয়াহর জন্য কারও কাছে টাকা বা অন্য কিছু চেয়েছি। সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামিনের। দাওয়াহ, বিয়ে পড়ানো, তালাক, লেকচার, হালাকা, সেমিনার—কোনো কিছুর জন্য আমি কখনোই টাকা নিইনি। যদিও সম্প্রতি বেশ কিছু উদার প্রস্তাব এসেছে। এর আগেও, যখন আমি আর বাবা ছিলাম না, আমাদের পরিবার খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখনো আমরা কারও কাছ থেকে কোনো কিছু নিইনি। তবে সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু ভিন্ন ছিল, কারণ আমাদের বিপদের সময় সাহায্য করার কেউ ছিলও না। যা হোক, পয়েন্ট হলো আজ আমি নিজের জন্য না, একজন মুসলিম ভাইয়ের জন্য আপনাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছি। তার ব্যাপারে আপনারা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে কথা বলুন। কিছুদিন আগে মুহাদ্দিস শাইখ সুলাইমান আল-আলওয়ান মুক্তি পেয়েছেন।[৫৮] সুবহানআল্লাহ এর এক সপ্তাহ আগেই আমি তাকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমি ভাইদের আহ্বান করেছিলাম তার জন্য দু'আ করতে। আর কিছুদিন পরই তিনি মুক্তি পেলেন। আসলে এ সবই আল্লাহর কাদর। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ

---

৫৮ ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফাতওয়ার কারণে আরও কয়েকজন শাইখসহ শাইখ আলওয়ানকে গ্রেফতার করে সৌদি প্রশাসন। সেবার তিনি ১৮ দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। পরবর্তী সময় ২৮ এপ্রিল ২০০৪ সালে আল-কাসিম থেকে সৌদি সরকার তাঁকে আবার গ্রেফতার করে। সৌদি প্রশাসন এ গ্রেফতারির জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করেনি। বলা হয়ে থাকে, সৌদি রাজপরিবারের মনমতো ফাতওয়া দিতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্যই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে (শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের উপরোক্ত লেকচারের সময়) তিনি মুক্তি পান। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ৩ অক্টোবর ২০১৩ তাঁকে সৌদি সরকার ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়।

'তিনি আমাকে জেল থেকে বের করেছেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'[৩]

সবকিছুই আল্লাহর ﷻ ইচ্ছার অধীন। তবে আল্লাহ ﷻ বিজয় দেওয়ার জন্য কিছু কিছু উপকরণকে কাজে লাগান। যেমন মুসার عليه السلام লাঠি। অনেক পশ্চিমা বিশ্লেষক বলেছে, টুইটারে তার সমর্থনে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল সেটা শাইখ আল-আলওয়ানের মুক্তির পেছনে একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর শাইখ আলওয়ানকে নিয়ে টুইটারে একটি ক্যাম্পেইন চালানো হয়। এটা ছিল তার মুক্তির এক সপ্তাহ আগে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ﷻ তাকে মুক্ত করেছেন। শাইখ আলওয়ান আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন আর তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যাপারটা এমন না। এ ধরনের মানুষদের জন্য কোনো বিচার-প্রক্রিয়া, কোনো আদালত নেই। কোনো আদালত নেই, কোনো অভিযোগও নেই। যখন ইচ্ছে তারা এই শাইখদের উঠিয়ে নিয়ে এসে কারাগারে ছুড়ে দেয়। সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমের প্রচারণার কারণে সৃষ্টি হওয়া চাপ ছিল এমন একটা উপলক্ষ—যার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ তাকে মুক্ত করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ সুলাইমান আল-আলওয়ান হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ৬টি হাদিসের কিতাব মুখস্থ করেছেন। হাদিসের সনদে থাকা বর্ণনাকারীদের তিনি ওইভাবে চেনেন, যেভাবে নিজ সন্তানদের চেনেন। অথচ এ মানুষটাকে ৯ বছর বন্দী করে রাখা হলো। এখানে ঘরে বসে আমরা হয়তো এসব প্রচারণার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করতে পারব না, তবে ওখানে এগুলোর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে যখন এ শাসকগোষ্ঠীর পতনের সময় ঘনিয়ে এসেছে এবং বিপর্যয় তাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। ইতিহাসের দিকে তাকান, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* পড়ুন। যারা এই শাসকগোষ্ঠীর চেয়েও শক্তিশালী ছিল, তাদেরও পতন হয়েছে। এরা তো চিরদিন বেঁচে থাকতে পারবে না, এদেরও পতন ঘটবেই।

কারাগার থেকে বের হবার পর শাইখ সুলাইমান আল-আলওয়ান বলেছিলেন, সব মুসলিম বন্দীকে আপনার দু'আয় স্মরণ করবেন। বিশেষ করে নাসির আল-ফাহ্‌দকে। কারণ, শাইখ নাসিরকে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নির্যাতন করছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فُكُّوا الْعَانِيَ

[৩] সূরা ইউসুফ, ১২: ১০০

সূচিপত্র



'তোমরা বন্দী মুক্ত করো।'[৫৮]

যেকোনো বন্দিই 'আনি'। ইবনু আসির ﷺ বলেছেন, লাঞ্ছিত ও অপমানিত যেকোনো ব্যক্তি 'আনি'। সুতরাং এমন একজন বন্দীর কথা চিন্তা করুন, যিনি একইসাথে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং নির্যাতিত। তিনি আনি, আনি, আনি এবং আনি। ইমাম মুসলিম ও সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। তারা একে অপরের ওপর যুলুম করে না, পরিত্যাগ করে না, তুচ্ছ করে না।"

ইয়াখযুলু অর্থ নিজের ভাইকে পরিত্যাগ করা, তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা। আলিমগণ বলেছেন, কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলে তাকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। একজন মুসলিমের জন্য তার সাহায্যপ্রার্থী ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক। একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে, যখন কোনো বৈধ ওযর থাকবে।

وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر

'যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।'[৫৯]

যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য চায়, আপনি তাদের সাহায্য করতে বাধ্য। লক্ষ করুন, আলিমগণ বলেছেন, যদি মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্য কোনো রাষ্ট্রের কোষাগারের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হয়, তবুও সেটা লোকসান হিসেবে গণ্য হবে না। আলিমগণ এ কথা বলেছিলেন এমন সময়ের প্রেক্ষাপটে যখন মুক্তিপণ চাওয়া হতো। একইভাবে আজ কাউকে মুক্ত করতে হলে উকিলের খরচসহ নানা ধরনের খরচাপাতির দরকার হয়। *তাফসির আল-কুরতুবি*-তে ইমাম মালিকের ﷺ একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইমাম মালিক বলেছেন, 'মুসলিমদের যা কিছু আছে তার সবটা দিয়ে হলেও মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা বাধ্যতামূলক। আর এ ব্যাপারে কোনো

---

[৫৮] *আহমাদ* : ১১৬৪১, *বুখারি* : ৩০৪৬

[৫৯] সূরা আনফাল, ৮ : ৭২

মতপার্থক্য নেই।'[৬০] শরিয়াহ আমাদের শিক্ষা দেয় মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টার পাশাপাশি তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়া ও কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করার।

আজকের প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হবে তাদের কাছে চিঠি লেখা, তাদের পরিবারগুলোকে সাহায্য করা, তাদের দেখাশোনা করা। *মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা*-তে উমার ইবনুল খাত্তাবের ﷺ একটি উক্তি আছে, 'সমগ্র আরব উপদ্বীপের চেয়েও একজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা আমার জন্য উত্তম।' এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর ﷺ অনেক উক্তি আছে। *মাজমু আল-ফাতাওয়া*-র ২৮ নম্বর খণ্ডের ৬৩৫ পৃষ্ঠায় শাইখুল ইসলাম বলেছেন,

فَكُّ الأسَارَى مِنْ أعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ، وَبَذْلُ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ وَغَيْرِهِ فِيْ ذَلِكَ مِنْ أعْظَمِ الْقُرُبَاتِ

'বন্দী মুক্ত করা সবচেয়ে সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করা—যেমন উকিলের খরচ বা এ রকম অন্য কিছু—হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে সম্মানিত মাধ্যমগুলোর অন্তর্ভুক্ত।'

তাই সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে লেখা অল্প কিছু কথা, এই সামান্য প্রচারণা হয়তো বিচারের দিনে আপনার ডানদিকের পাল্লা ভারী হবার কারণ হবে, আপনাকে ফিরদাউসে নিয়ে যাবে। আল্লাহ শাইখ নাসিরের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। আল্লাহ শাইখ খালিদ আর-রাশিদসহ অন্যান্য বন্দী আলিমদের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। আল্লাহ আমাদের ভাইবোনদের বন্দিত্বের শেকলগুলো ভেঙে দিন। হে আল্লাহ, তারা আপনার রাহমাহর মুখাপেক্ষী। তাই আপনি তাদের ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন। যারা তাদের ক্ষতি করতে চায়, তাদের ক্ষতি থেকে আপনি তাদের হেফাযত করুন। হে আল্লাহ, যারা তাদের ক্ষতি করতে চায়, আপনি তাদের ক্ষতি করুন।

---

[৬০] *তাফসির আল-কুরতুবি*: ৫/২৫৭

একজন মুসলিম, একজন দা'ঈ হিসেবে আপনাকে সব সময় এই সত্য পথের ওপর অটল থাকতে হবে। অন্যরা যে চোখে দুনিয়াকে দেখছে, আপনি সেভাবে দুনিয়াকে দেখতে পারবেন না। ওদের কাছে জীবন হলো প্রাইমারি, জুনিয়র, হাইস্কুল ও কলেজ শেষ করা। ওদের কাছে জীবন হলো অনার্স, মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা। এরই মধ্যে বা এর পর হয়তো বিয়ে করা, বাচ্চা জন্ম দেওয়া, তাদের বড় করে তোলা, চাকরি-বাকরি করা। সবশেষে রিটায়ারমেন্ট, রকিং চেয়ারে দোল খাওয়া। কোনো সমুদ্রসৈকত কিংবা নিরিবিলি রিসোর্টে স্ত্রীর সাথে বসে নাতি-নাতনিদের খেলা দেখা আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। ওদের কাছে এই হলো জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু একজন মুসলিমের জন্য সমীকরণটা আলাদা। একজন মুসলিম জানে, তার জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। এসব পার্থিব বিষয়াদি কখনোই আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হতে পারে না।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'বলুন হে মুহাম্মাদ, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।'[৬১]

আমাদের জীবন শুধুই আল্লাহর ﷻ জন্য। আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের সব প্রচেষ্টা, আর শুধু তাঁর জন্যই এ পথের সব বাধা-বিপত্তি আর কষ্ট সহ্য করা। আমরা কখনো পরীক্ষা কামনা করব না, কিন্তু যদি পরীক্ষা আসে আমরা আল্লাহর ﷻ দীন ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমরা ধৈর্য ধরব। দীনের প্রশ্নে আপসহীন একজন নীতিমান ব্যক্তির জন্য পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। এ ধরনের মানুষকে পরীক্ষার মোকাবেলা

[৬১] সূরা আল-আনআম, ৬ : ১৬২

# সূচিপত্র

মোকাবেলা করতেই হবে। আর যারা হকের দিকে আহ্বান করেন তাঁদের জন্য এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, মানুষের বানানো বিভিন্ন নোংরা, অর্থহীন আদর্শের অনুসারীরা যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করে, নিজ নীতির ওপর অবিচল থাকার ও আপস না করার যে দৃঢ়তা তাদের মধ্যে দেখা যায়, অন্তত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনুসারীর মধ্যে ততটুকু সবর, ততটুকু দৃঢ়তা দেখা যায় না। আপনার মাফিয়া নেতা, খুনি, কমিউনিস্টসহ বিভিন্ন মতাদর্শের লোকের জীবনী পড়ে দেখুন। জন গারডি বা এ-জাতীয় অন্যান্যদের জীবনী পড়ে দেখুন। অবাক হয়ে যাবেন। নোংরা আদর্শের জন্য এই লোকগুলোর মধ্যে আত্মত্যাগের যে মানসিকতা ছিল আজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাহকদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আপনার সবাই সম্ভবত বিখ্যাত ক্বারি আবু বকর আশ-শাতরিকে চেনেন। আমার বাবার কাছ থেকে আবু বকর আশ-শাতরির একটি সাক্ষাৎকারের কথা শুনেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার তিলাওয়াতের মধ্যে এক ধরনের বিষণ্ণতা খুঁজে পাওয়া যায়। কেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন, "কুরআন হিফয শুরু করার পর থেকে আমি একের পর এক দুর্যোগের সম্মুখীন হই। আজ পর্যন্ত আমি একের পর এক বিপর্যয়ের মোকাবেলা করে যাচ্ছি।" এই হলো মুমিনের পার্থিব জীবন। আপনাদের কাজ হলো সবর করা, সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকা।

এ উপলব্ধিকে আপনার মন, মগজ ও অন্তরে গেঁথে নেবেন। যাতে করে যেদিন পরীক্ষার মুখোমুখি হবেন সেদিন যেন তার মোকাবেলা করতে পারেন। এটি এমন এক পরীক্ষা যেটাতে বেশির ভাগ মানুষ আটকে যায়। চাইলে এমন অনেকের নাম বলা যাবে যারা সামান্য পরীক্ষার কারণে সত্যের পথ ত্যাগ করেছে। এমন অনেক জনপ্রিয় নাম আর মুখ আছে যারা এমনসব সামান্য বিষয়ের জন্য সত্যকে ত্যাগ করেছে যেগুলোকে আসলে পরীক্ষাও বলা যায় না। তারা যখন দেখল, দুনিয়া পাল্টাতে শুরু করেছে, সত্যের প্রতি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছে—সাথে সাথে নিজেদের আদর্শকে ছুড়ে ফেলল। আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া এ ধরনের লোকেরা কীভাবে ধৈর্যের সাথে পরীক্ষার মোকাবেলা করবে? কীভাবে এমন একজন মানুষ বিপদের সময় আল্লাহকে ﷻ পাশে পাবার আশা করে?

পরিশেষে, আমার বাবার বলা কিছু কথা উল্লেখ করব। কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রাখার মতো। প্রজ্ঞার পাশাপাশি যে পরিস্থিতিতে কথাগুলো বলা হয়েছিল সেটাও একে গভীর অর্থবোধকতা দান করেছে। আমি আগেই বলেছি, কারাগারের একটা সময় আমরা সলিটারি সেলে কাটিয়েছি। প্রথমে আমাদের দুজনকে আলাদা

আলাদা সেলে রাখা হয়েছিল। দুজনের সেল ছিল সলিটারি ওয়ার্ডের দুই প্রান্তে। কথা বলা, দেখা করা, এমনকি একজন আরেকজনের খোঁজ নেওয়ারও কোনো উপায় ছিল না।

কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে জেলার একবার সলিটারি সেলের বন্দীদের পরিদর্শনে আসত। পরিদর্শনের সময় সে নিয়ম করে প্রতিটি সেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বন্দীর অবস্থা দেখত। একবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমাকে সলিটারিতে রাখা হয়েছে?

"কারণ তুমি সন্ত্রাসী, তুমি অন্য কয়েদিদেরও তোমার মতাদর্শে গড়ে তুলতে পারো, তাদের সংগঠিত করতে পারো।"

"তোমার এই অভিযোগের পেছনে প্রমাণ কী??"

"কারাগারের মুসলিম ইমাম তোমার ব্যাপারে লম্বা রিপোর্ট দিয়েছে।"

আসলে উম্মাহর সমস্যার মূলে মুনাফিকরাই। কারাগারের ইমাম আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিল। আমি জেলারকে বললাম, তুমি আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করলে, কিন্তু আমার বাবার ব্যাপারে কী বলবে? তাঁকে কেন সলিটারিতে রাখা হয়েছে? সে আমার বাবার ব্যাপারেও সেই একই অভিযোগ করল, অথচ বাবা জেলে খুব অল্পই কথা বলতেন।

আমি আবার বললাম, তোমরা আমাদের আলাদা রেখেছ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি কেন তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগও পাই না?

"তোমরা সবাইকে নিজেদের মতো চরমপন্থী বানাও, তাই তোমাদের সবার কাছ থেকে আলাদা রাখা হয়েছে।"

"ঠিক আছে, আমার আর বাবার বিরুদ্ধে তোমার এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে এটা তো একটা ছোঁয়াচে অসুখের মতো। আর আমরা দুজনই যেহেতু এই রোগে আক্রান্ত তাই তুমি আমাকে আর আমার বাবাকে একই সেলে রাখলে তোমাদের জন্যই ভালো। তখন এ অসুখ আর অন্য কারও মধ্যে সংক্রমিত হবে না।"

একথা শুনে গর্দভটা কিছুক্ষণ চিন্তা করে, যাবার সময় অর্ডার দিয়ে গেল, আমাদের দুজনকে যেন একই সেলে রাখা হয়। তারপর বাবাকে আমার সাথে একই সেলে রাখা হলো। বাবার সাথে কাটানো সেই দিনগুলো ছিল আমার কারাজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সলিটারিতে কাটানো মোট নয় মাসের মধ্যে প্রায় তিন বা চার মাস আমরা একই

সেলে কাটিয়েছি। আমি এ সময় দেখেছি আমার বাবা হাসিমুখে সব পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। আজ অবধি তা-ই আছে। যা-ই ঘটুক না কেন তাঁর মধ্যে কখনো অসন্তোষ দেখিনি, তাঁকে সব সময় ধৈর্যশীল ও পরিতৃপ্ত পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ বারিক লাহু, আল্লাহ ﷻ তায়ালা তাঁকে নেক আমল-সমৃদ্ধ দীর্ঘায়ু দান করুন।

আমাদের ছোট্ট সেলে ওপর-নিচ দুটো বেড ছিল।[৬২] বাবা ঘুমাতেন নিচের বেডে, আমি ওপরেরটায়। তাঁর সময় কাটত সালাত আর কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে। ওপর থেকে আমি দেখতাম সব সময় তাঁর মুখে হাসি লেগেই থাকত। তিনি কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতে ভালোবাসতেন। অন্যান্য বন্দীরা প্রতিরাতে তাঁর সূরা কাহাফের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করত। অনেকে চিৎকার করে তাঁর কাছে নাসীহাহ চাইত। তিনি হাসিমুখে সবার কথার জবাব দিতেন। মাঝে মাঝে তিনি সেলের দরজায় দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন। দরজার শিক ধরে দাঁড়িয়ে জোরে কথা বললে সবাই শুনতে পেত। খুতবাহতে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকেই নাসীহাহ দিতেন। আমরা সলিটারিতে থাকা অবস্থায় অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ তাঁর উস্তাদ ইবনু তাইমিয়্যাহর ﷺ ব্যাপারে বলেছিলেন, যখন আমাদের ঈমান দুর্বল হয়ে যেত, আমরা আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহর শরণাপন্ন হতাম। তাঁর সামনে কয়েক মুহূর্ত কাটালেই তাঁর কথা আমাদের ঈমানকে তরতাজা করত। আমার বাবার ক্ষেত্রেও আমি তা-ই লক্ষ করেছি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নেক আমল-সমৃদ্ধ দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর বরকতময় চেহারা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও হাসি মুছে যেত না। শুধু গভীর রাতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন, সিজদাহয় পড়ে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষে করতেন।

শীতের সময় মিশিগানে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে চলে যায়। কারাগারে ছিল বরফজমাট শীত। সেন্ট্রাল হিটিং বা তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এরই মধ্যে ওরা আমাদের কাছ থেকে সব কম্বলও নিয়ে গিয়েছিল। কখনো কখনো দিনের পর দিন ওরা আমাদের কোনো খাবার কিংবা পানি দিত না। ইরাক-ফেরত নির্দয় ও নিষ্ঠুর পশুগুলো বন্দীদের ওপর নিজেদের আক্রোশ মেটাতে চাইত। আসলে তাদের পশু বলাও উচিত না, এতে বরং পশুদের অসম্মান করা হয়। তবে কয়েকজন ব্যতিক্রমও ছিল। এক মেক্সিকান গার্ডের কথা মনে আছে, যে তখন মাত্র ইরাক থেকে ফিরেছে। অ্যামেরিকার নাগরিকত্ব পাবার জন্য সে আর্মিতে যোগ দিয়েছিল। ওদের একটি

[৬২] আমাদের দেশের ট্রেনের কেবিনের মতো।

আইন আছে কেউ যদি অ্যামেরিকান আর্মির হয়ে কয়েক বছর যুদ্ধ করে তবে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই গার্ডটি নিয়মিত আমাদের সেলের সামনে এসে দাঁড়াত। আমার বাবার দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে ফেলত আর বলত, আমি জানি না ওরা কীভাবে আপনার সাথে এমন আচরণ করছে। তবে এ ধরনের লোক হলো ব্যতিক্রম আর নিয়ম কখনো ব্যতিক্রমদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় না।

আমার ও বাবার সেল আলাদা করে দেবার কয়েকদিন আগের কথা। ওপরের বেডে বসে আমার বাবার আলোকদীপ্ত মুখ আর উজ্জ্বল হাসির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি হাঁটছিলেন। এটা ছিল তাঁর রোজকার রুটিন। অল্প জায়গার মধ্যেই পায়চারি করতেন আর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমি বললাম, আব্বু আপনার কি কখনো নিজের ঈমান নিয়ে সংশয় হয়েছে? যে পরীক্ষা আর কষ্টের সময় আমরা অতিক্রম করছি এগুলোর কারণে কখনো কি আপনার ঈমান দুর্বল হয়েছে?

এ সময় আমার বাবা এমন এক অবস্থায় ছিলেন যখন কারাগারে তাঁর ওপর নির্যাতন চলছে, পুরো পৃথিবী তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করেছে, তিনি নিজে অসুস্থ, বাসায় তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। একের পর এক বিপদ তাঁর ওপর আসছে। চেনা একজন মানুষকেও বিপদের সময় নিজের পাশে পাননি, তাঁর সব সম্পদ তিনি হারিয়েছেন, শুধু সম্পদ না জাগতিক প্রায় সবকিছুই তিনি হারিয়েছেন। পরীক্ষার সময় মাঝে মাঝে এমন অবস্থা আসে যখন রাসূলগণও আশাহীন হয়ে পড়েন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ

'অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলো এবং লোকে ভাবল যে, তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল। তারপর আমি যাকে ইচ্ছা করলাম উদ্ধার করা হলো।'[৬৩]

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

[৬৩] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১১০

'তাদের ওপর ভীষণ বিপদ ও কষ্ট এসেছিল আর এতে তারা এমনভাবে শিহরিত হয়েছিল যে, নবি ও তাঁর সাথি ঈমানদার লোকেরা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই!'[৬৬]

রাসুল ﷺ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবিরা رضي الله عنهم তীব্র দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিপদের তীব্রতায় তাঁরা এতটাই বিপর্যস্ত হয়েছিলেন যে, রাসুল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা رضي الله عنهم বলেছিলেন, কখন আসবে আল্লাহর عز وجل সাহায্য? তাই রাসুলগণও এতোটাই কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, যখন তাঁরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন। রাসুলগণকেও এতো ভয়ঙ্কর কঠিন সময় পার করতে হয়েছে।

এতসব কথা এ জন্য বললাম যাতে উপলব্ধি করতে পারেন, কোন পরিস্থিতিতে কথাগুলো বলা হয়েছিল। কারণ, হাজার কিংবা পাঁচ শ ডলার দামের ম্যাট্রেসের ওপর শোয়া অবস্থায়, নরম উষ্ণ বিছানায় স্ত্রীকে পাশে নিয়ে বলা কথা, আর শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে কোনো কম্বল ছাড়া কারাগারের নির্জন অন্ধকার কক্ষে শুয়ে বলা কথা এক রকম নয়।

আমি বাবাকে প্রশ্ন করলাম, আব্বু আপনার কি কখনো নিজের ঈমান নিয়ে সংশয় হয়েছে? যে পরীক্ষা আর কষ্টের সময় আমরা অতিক্রম করছি এগুলোর কারণে কখনো কি আপনার ঈমান দুর্বল হয়েছে? প্রশ্ন শুনে অন্ধকার কারাগারেও যেন তাঁর মুখ আলোকিত হয়ে উঠল। শান্ত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জীবন্ত কারও কাছে থেকে শোনা সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন,

"প্রিয়, আমাদের সাথে যদি এমন না ঘটত, তাহলে আমি সংশয়ে থাকতাম। এই পরীক্ষা যদি আমাদের ওপর না আসত, তাহলে বরং আমি আমাদের মানহাজ নিয়ে সংশয়ে ভুগতাম।

[৬৬] সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২১৪